বাংলাদেশ দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল

মাবরুর মাহমুদ

এক্সক্লুসিভ পেপার ২
জানুয়ারী ৭, ২০১৭

[এই পেপারের যে কোন মন্তব্য এবং ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী]

সুচীপএ

১. ভূমিকা ৩

২. শুরুর কথা ৫

২. প্রাসঙ্গিক কিছু ধারণা ১৫

৩. কাশেম মিঞা এবং সোলেমানের গল্প ... .২০

৪. কাশেম মিঞার জীবন শিক্ষা.. ... ...৩২

৫. কাশেম মিঞার জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা... ... ...৩৫

৬. দারিদ্র্যের কারণ এবং "দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন তত্ব". ৩৮

৭. তত্বের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ... ... ...৫১

৮. মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার কুফল ৬২

৯. বাংলাদেশ দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল ৬৪

১০. মডেলটির পরীক্ষা ৮৩

১১. প্রস্তাবিত মডেলটির সুফল. ... .৮৫

১২. মডেলটি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ..... ... ...৮৮

১৩. মডেলটির সীমাবদ্ধতা ১০২

১৪. শেষ কথা ১০৫

সংযুক্তি – ১ দ্রব্যমূল্য কিভাবে বাড়ে, কমে? ১০৭

সংযুক্তি – ২ সরকারের সাম্প্রতিক দুটি পদক্ষেপ.. ... .১১১

Bibliography ১১৫

ভূমিকা

“বাংলাদেশ দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল” শীর্ষক এই পেপারটি আমরা তৈরি করেছিলাম ২০০৯ সালের শুরুতে। অনেকের হয়তো মনে আছে সে সময় বিশ্বব্যাপী চালের বাজার মূল্য বেড়ে গিয়েছিল যার বিরূপ প্রভাব পড়েছিল বাংলাদেশেও। চালের এই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কিভাবে কৃষকদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছিলাম বেশ আগ থেকেই। আমাদের পেপারটি ছিল সেই চিন্তারই ফসল।

আমাদের ইচ্ছা ছিল যত দ্রুত সম্ভব এই পেপারটি আইএফডি’র পক্ষ থেকে প্রথম পেপার হিসাবে প্রকাশ করার। কিন্তু পেপারটি প্রকাশ করার আগ মুহূর্তে আমরা অনলাইন গবেষণা করতে গিয়ে জানতে পারি আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে এই মডেলের সবচেয়ে কাছাকাছি একটি মডেল অনেক আগ থেকেই চালু রয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়ান সরকারের নজরের অভাবে মডেলটি কৃষকদের খুব একটা কাজে আসছে না। ইন্ডিয়াতে এই মডেলটির নাম **“নিয়ন্ত্রিত বাজার”** বা **“রেগুলেটেড মার্কেট”**।

তাই আমাদের মনে হতে লাগল, পেপারটি প্রকাশের আগে এই বিষয়ে আমাদের আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তাই পেপার প্রকাশের চিন্তাধারা সেখানেই থেমে যায়। আমরা তখন মন দেই **“অবয়বহীন দুর্নীতি”** শীর্ষক এক্সক্লুসিভ পেপার প্রকাশে যা আইএফডি থেকে প্রথম পেপার হিসাবে প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের ১৩ আগস্ট।

যাই হোক, আমাদের কাছে এখন মনে হচ্ছে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলটি আর লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করে ফেলা উচিত। তবে মনে রাখা দরকার, এই পেপারটি শুধুমাত্র প্রথম ড্রাফট। এই বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে যা যুক্ত করা হবে পেপারটির ভবিষ্যৎ সংস্করণে।

আমরা যত দ্রুত সম্ভব এই পেপারটির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশের আশা রাখি, ইন শা আলাহ। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের পর এই পেপারে শুধুমাত্র এই ভূমিকাটি ছাড়া আমরা আর কোন বড় পরিবর্তন করিনি।

তবে মজার বিষয় হল আমরা এই পেপারে যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছি, বিগত ৭ বছরেও এই সমস্যাটি যেমন ছিল, ঠিক তেমনই আছে। কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই আমরা মনে করি, এই পেপারে বিভিন্ন তথ্য হালনাগাদ করা না হলেও তথ্যগুলি এখনো প্রাসঙ্গিক। তাই এই পেপারের পুরো মজা পেতে হলে আপনাকে চলে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় ৭ বছর আগে!

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি

বাংলাদেশ দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল

১.শুরুর কথা

ঘটনাটি ১৯৯৭ সালের।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাএ। একদিন বাংলামটরের ট্রাফিক জ্যামে রিক্সার মধ্যে আটকে আছি। সঙ্গে আছে এক বন্ধু।

হঠাৎ দেখলাম কাছেই এক তরুণ সাংবাদিক রিক্সার যাএীদেরকে মাইক্রোফোন হাতে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন। তার সাথে এক ফটো সাংবাদিক। তিনি সাথে সাথে ছবি তুলছেন।

কয়েকজন যাএীকে প্রশ্ন করার পর তরুণ সাংবাদিক আমাদের কাছে এলেন। প্রশ্ন করলেন, এখন যে ট্রাফিক জ্যামে আমরা আটকে আছি, তার থেকে পরিএাণের উপায় কি?

প্রশ্নকর্তা আমাকেই প্রশ্নটি করেছিলেন।

আমি সাথে সাথে উত্তর দিলাম, ট্রাফিক জ্যাম মূলত হচ্ছে অতিরিক্ত রিক্সার কারণে। যেহেতু গ্রাম থেকে শহরে মানুষ নিয়মিতভাবে চলে আসছে, তাই শহরে রিক্সার সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু আমাদের রাস্তাঘাট এতো রিক্সার জন্য উপযোগী নয়। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে যদি চাঙ্গা করা যায়, তাহলে শহরমুখী মানুষের ঢল কমবে। ফলে রিক্সাও কমবে। তাই রিক্সায় বসেও আমি বলতে চাই, ঢাকায় রিক্সার সংখ্যা কমানো উচিত। সেইসাথে সরকারের উচিত পাতাল রেলের ব্যবস্থা করা।

সাংবাদিক আমার উত্তর শুনে আবারো প্রশ্ন করলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে কি করে চাঙ্গা করা যায়? আপনার কি মনে হয়?

আমি বললাম, পর পর পাঁচ বছর যদি ফসলের ন্যায্য দাম দেয়া যায়, তাহলেই গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং এতে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যাবে।

এই উত্তর দেয়ার পর ফটো সাংবাদিক আমাদের কয়েকটি ছবি তুললেন। এরপর তরুণ সাংবাদিকটি আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন আরেক যাত্রীর কাছে।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি আমার এক বান্ধবী একটি পত্রিকার ক্লিপিং নিয়ে এসে হাসাহাসি করছে, সবাইকে কি যেন দেখাচ্ছে। আমি কাছে যেতেই সে বলল, *কি রে, তোর তো ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। দেখ দেখ।*

আমি দেখলাম, বাংলাবাজার নামের পত্রিকাটিতে বেশ কয়েকজনের ছবির সাথে আমার ছবি এবং ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া ছাপা হয়েছে ছোট করে।

এই ক্লিপিং দেখে আমার বন্ধুরাও আগ্রহ নিয়ে আমার মন্তব্যগুলি পড়ল। এক জোকার বন্ধু ফোড়ন কেটে বলল, *তুই যে পাতাল রেল করার কথা কইসস, তা আমিও যেমন জীবনে দেখি নাই, আমার নাতিও তেমনি দেখব না। তাই এইসব কথা সবার সামনে কইস না।*

এই মন্তব্যগুলি আমি সেসময় করেছিলাম তেমন কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে আমার করা মন্তব্যটি ছিল শুধুই তাৎক্ষনিক একটি প্রতিক্রিয়া। এনিয়ে সেসময় আমার যেমন কোন গভীর চিন্তাভাবনা ছিল না, তেমনি এই বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে যে আমার আরো চিন্তাভাবনার সুযোগ ঘটবে, তা নিয়েও আমার বিন্দুমাত্র কোন ধারণা সেসময় ছিলনা।

তবে খুব সম্ভবত তখনকার পত্রিকাগুলিতে ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে কৃষকদের হতাশা বিষয়ে বেশ কয়েকটি রিপোর্ট আমি পড়েছিলাম। হতে পারে সেই সকল রিপোর্ট পড়েই আমার মনে এমন একটি ধারণা হয়েছিল যে কৃষকদেরকে যদি তাদের শস্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়, তাহলে খুবই দ্রুত গতিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

যাইহোক, এর কিছুদিন পর আমাদের একটি কোর্সে একটি এসাইনমেন্ট দেয়া হয়। কোর্সটির নাম ছিল প্রজেক্ট এপ্রাইজাল (Project Appraisal)। আমাদের কোর্স টিচার ছিলেন মিজ রাশেদা হুদা। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন একটি প্রজেক্ট তৈরি করে তার কাছে জমা দিতে। এই এসাইনমেন্টটির মার্ক যুক্ত হবে কোর্স ফাইনালের সাথে। তাই এসাইনমেন্টটি গুরুত্বপূর্ণ।

এসাইনমেন্টটি করার সময় হটাৎ করেই একটি বিজনেস প্রজেক্টের ধারণা আমার মাথায় আসে। প্রজেক্টটির মাধ্যমে পণ্য প্রস্তুতকারক এবং ভোক্তার মধ্যে দুরত্ব কমিয়ে এনে পণ্যের দাম কমিয়ে আনা হবে। ফলে উৎপাদক যেমন অধিক মূল্য পাবে, তেমনি ভোক্তা লাভবান হবে তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করে।

আমি আইডিয়াটির নাম দিয়েছিলাম **"কুটির"**। এই আইডিয়ার আওতায় ***কুটির*** নামের বিভিন্ন বৃহৎ স্থাপনা তৈরি করা হবে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে পণ্য উৎপাদকেরা যাবেন তাদের পণ্য নিয়ে। একটি নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে তারা তাদের পণ্য সবাইকে দেখাতে পারবেন। ***কুটিরে*** থাকবে একটি মান নিয়ন্ত্রক টিম। তারা পণ্যের মান নিশ্চিত করবে। ফলে উৎপাদক বাঁচবে অধিক মার্কেটিং খরচ থেকে এবং ভোক্তার পক্ষেও সম্ভব হবে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করা।

এই আইডিয়াটি আমি মনে মনে লালন করেছি দীর্ঘদিন। আমার মনে হয়েছে আমার যদি ভবিষ্যতে কখনো সুযোগ হয়, তাহলে আইডিয়াটি আমি বাস্তবায়ন করব।

আমি সুযোগ খুঁজছিলাম আমার আইডিয়াটি এমন একজন ব্যক্তিকে বলার যিনি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং যার সাহায্যে আমি আইডিয়াটি ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে পারব। তাই আমি এমন একজনকে মনে মনে খুঁজছিলাম যিনি নিজেও একজন আইডিয়ার কারিগর।

সুযোগটি আসে আরো অনেকদিন পর। ২০০০ সালে।

তখন সবেমাএ আমি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছি একজন ইন্টার্ন হিসাবে। সিরডাপ মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানটির একটি অনুষ্ঠানে সেসময় প্রফেসর ইউনূস এসেছিলেন প্রধান অতিথি হয়ে। আমি তখন তাকেই টার্গেট করলাম। আমি জানতাম প্রফেসর ইউনূস একজন আইডিয়ার কারিগর। তাই আমার মনে হল তাকে আমার আইডিয়াটি খুলে বললে হয়তো কাজ হলেও হতে পারে।

প্রফেসর ইউনূসকে টার্গেট করার আরও একটি কারণ ছিল। এর কিছুদিন আগেই তার সহায়তায়ই গ্রামীণ ফোন যাএা শুরু করেছিল। গ্রামীণ ফোনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী মি. ইকবাল কাদির। আমি জানতাম মি. ইকবাল তার আইডিয়াটি বাস্তবায়নের জন্য প্রফেসর ইউনূসের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তার সাহায্যেই মি. ইকবালের আইডিয়াটি বাস্তবে রূপ পেয়েছিল।

তাই মি. ইকবাল কাদির ছিলেন আইডিয়ার রূপকার, কিন্তু প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস ছিলেন আইডিয়াটির সফল বাস্তবায়নকারী। মি. ইকবাল যদি প্রফেসর ইউনূসের সাহায্য না পেতেন, তাহলে হয়তো বাংলাদেশ মোবাইল ফোনের বিপ্লবের দিক দিয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় আজো অনেক পিছিয়ে থাকতো।

যাইহোক, অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পর আমি প্রফেসর ইউনূসকে হঠাৎ করেই একাকী পেয়ে যাই সিরডাপ মিলনায়তনের নীচের তলায়।

তার সামনে গিয়ে আমি নিজের পরিচয় দেই এবং তাকে জানাই আমি তার সাথে দেখা করে একটি আইডিয়া দিতে চাই। এই আইডিয়াটি শুনলে সবাই হাসে। তাই আমি এমন একজনকে বলতে চাই যিনি আমার আইডিয়াটি শুনে অন্তত হাসবেন না।

তিনি আমার এপ্রোচ দেখে হেসে দিলেন। পকেট থেকে তার একটি কার্ড বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, *তুমি আমার সাথে যেকোন সময় এসে দেখা করে তোমার আইডিয়াটি আমাকে বলবে।*

আমি জানতে চাইলাম, তার সাথে কোন প্রকার এপয়েন্টমেন্ট করার প্রয়োজন আছে কিনা।

তিনি না সূচক উত্তর দিয়ে আমাকে জানালেন, যে কোন সময় অফিসে গিয়ে দেখা করতে চাইলেই তিনি আমার সাথে দেখা করবেন। এর জন্য কোন এপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন নেই।

তার সাথে আমার সেই দেখা করা এখনো হয়নি। কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই আমি তখন আমার আইডিয়াটিকে আরো দুর নিয়ে যাবার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না।

এরপর আমি আমেরিকায় চলে যাই মাস্টার্স করার জন্য। আবারো ফিরে আসি ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে এবং পুনরায় গবেষণা কাজে হাত দেই।

আমার কেন জানি তখন মনে হয়েছিল এই আইডিয়াটিকে কৃষকদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে তাদের শস্যের ন্যায্যমূল্য দেয়া সম্ভব। তাই আমি এর উপর ভিত্তি করে কয়েক পাতার একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরি করে ফেলি। আমার উদ্দেশ্য ছিল

ভবিষ্যতে সময় এবং সুযোগ পেলে আমি এই আইডিয়াটি নিয়ে আমার একটি গবেষণা চালু করব।

আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, আগামী বেশ কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে দ্রব্যমূল্য নিয়ে একটি ইস্যু সৃষ্টি হবে। এর বিশেষ কয়েকটি কারণ ছিল। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যা আয়তনে খুবই ছোট, কিন্তু জনসংখ্যা খুবই বিশাল। আমাদের একটি জেলায় যে সংখ্যক মানুষ বাস করে, এতো সংখ্যক মানুষ অনেক দেশেই নেই। এই অধিক জনসংখ্যা ঘনত্বের কারণে আমাদের দেশে শস্যের চাহিদা সবসময়ই সরবরাহের তুলনায় বেশি থাকার সম্ভাবনা বেশি।

সেইসাথে বাংলাদেশ এখন দারিদ্র্য বিমোচনের এমন একটি পর্যায়ে রয়েছে যে এখানে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য চাহিদা খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। কারণ যে এখন একবেলা খেতে পাচ্ছে, তার আয় বৃদ্ধি পেলে সে সবার আগে খাদ্য কিনে দুইবেলা খাওয়ার চেষ্টা করবে। এই অতিরিক্ত আয়ের বেশির ভাগ টাকাই সে ব্যয় করবে তার ক্ষুধা নিবারণে।

আমি যখন এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম, তখন দেশের সামগ্রিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত আছে। তাই তৎকালীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা যে পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যেই একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হবে তা আগেভাগেই বলার জন্য আমাকে কোন জ্যোতিষের কাছে যেতে হয়নি।

যাইহোক, এই কারণগুলি চিহ্নিত করে আমার ধারণা হয় আমি যদি আমার আইডিয়াটি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা তখনই করে ফেলি, তাহলে সেটি ভবিষ্যতে বেশ কাজে লাগবে।

তবে সেই গবেষণা আমার আর তখন করা হয়নি। দেশ ছেড়ে সৌদি আরবে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াতে আমার গবেষণা ক্যারিয়ারে ছেদ পড়ে। আমি গবেষণার চাকরিটি ছেড়ে দেই ২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসের ৩১ তারিখে। কিন্তু নতুন চাকরি নিশ্চিত হলেও আমি তখনো ভিসা পাইনি। বিভিন্ন কারণে ভিসা পেতে দেরী হচ্ছে। তাই বাসাতেই বসে আছি।

তবে বাসায় শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেই আমি আমার আইডিয়াকে একটি ফর্মাল শেপ দেব। কিন্তু ফর্মাল শেপ দিতে হলে তো একটি জরিপের প্রয়োজন। আমার আইডিয়াটি আসলেই ঠিক আছে কিনা তা মাঠ পর্যায়ে যাচাই করতে হবে।

কিন্তু জরিপ করবে কে? একটি ব্যাপকভিত্তিক জরিপের জন্য তো অনেক টাকা এবং লোকবলের প্রয়োজন। এতো টাকা তো আমার নেই। আমার এমন কোন গবেষক দলও নেই যারা আমার হয়ে জরিপটা করে দিবে।

তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম জরিপটা আমি একাই করব এবং তা করব নিজের টাকাতেই। একা একা জরিপ করাতে হয়তো খুব বেশি কিছু আমি করতে পারব না, কিন্তু কিছুটা হলেও তো মাঠপর্যায়ের একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

তাই ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৩ তারিখে আমি বের হয়ে যাই জরিপ করার উদ্দেশ্যে।

সেই জরিপে কোন দাতাসংস্থা আমাকে কোন ব্র্যান্ড নিউ পাজেরো জীপ দেয়নি। আমাকে জরিপটি করতে হয়েছিল সেনাবাহিনী থেকে নিলামে কেনা আমার বাবার সেকেন্ড হ্যান্ড ল্যান্ড ক্রুজার জীপটি নিয়ে। তেলের টাকা দিতে হয়েছিল আমার পকেট থেকেই।

তবে গাড়িটি আমি নিজে চালাইনি। কারণ আমি তখন গাড়ী চালানো জানতাম না।

জরিপ করতে গিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেই গাড়ি চালিয়ে আমি উত্তর বঙ্গের দিকে যেতে থাকব। মাঝে মাঝে সরু রাস্তা ধরে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কৃষকদের শস্যমূল্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব।

সেই একদিনের জরিপে আমি ঢাকা, পাবনা এবং বগুড়া জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কৃষকদেরকে সরাসরি কিছু প্রশ্ন করেছি। তারাও এর উত্তর দিয়েছেন বেশ উৎসাহ ভরেই।

এই জরিপটি করার পর আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে আমি ঠিক পথেই এগুচ্ছি। এটাও প্রমাণিত হয়, আমি যা ধারণা করেছিলাম তা ঠিক।

আমি দেখলাম অধিকাংশ পণ্যের উৎপাদক তার পণ্যের মূল্য কতো হবে তা নিজে ঠিক করতে পারলেও কৃষক শস্য উৎপাদন করে তার মূল্য কতো হবে, তা সে নিজে ঠিক করতে পারেনা।

যেমন একটি লাক্স সাবানের বিক্রয় মূল্য কত হবে তা ঠিক করে উৎপাদক ইউনিলিভার। তারা পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে লাভ যোগ করে একটি মূল্য নির্ধারণ করে এবং সেই মূল্যেই কোম্পানীটি তার পণ্য মধ্যস্বত্বভোগীদের (যেমন, ডিস্ট্রিবিউটর, খুচরা বিক্রেতা) কাছে বিক্রি করে। এই মূল্য কোন ডিস্ট্রিবিউটর, আড়তদার, ফড়িয়া, বা খুচরা ব্যবসায়ী ঠিক করেনা। পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে ইউনিলিভার তার লাক্স সাবানের দাম বাড়িয়ে দেয়। ফলে লাক্স সাবানের খুচরা মূল্য বেড়ে যায়, কিন্তু ইউনিলিভারের লাভ সেই একই থাকে।

এই ব্যাপারটি কোকাকোলা, বোম্বে চিপস, প্রাণ চানাচুরসহ অন্যান্য অধিকাংশ পণ্যের বেলাতেও প্রযোজ্য।

অথচ বাংলাদেশের খেটে খাওয়া কৃষক তার ঘাম ঝরিয়ে শস্য উৎপাদন করলেও সে তার পণ্যের দাম একইভাবে ঠিক করতে পারে না। তাকে নির্ভর করতে হয় বাজার মূল্যের উপর যা মূলত ঠিক করে ফড়িয়া, আড়তদার, কিংবা চাল কলের মালিকরা[১]।

এই ব্যাপারটি ঘটে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। নিজের পণ্যের দাম যে নিজেই ঠিক করতে হয়, এই ধারণাটিই আসলে কৃষকদের মধ্যে নেই। ফলে তারা এই ব্যাপারটির বিরোধীতা কখনোই করেনি। কারণ তাদের পূর্বপুরুষদেরকেও তারা এভাবেই শস্য বিক্রি করতে দেখেছে।

কিন্তু এই ব্যাপারটি সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিনা তা জানার জন্য সারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি আমাকে জানতে হবে। এর জন্য শুধু কয়েকটি গ্রামের জরিপই যথেষ্ট নয়।

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত সীমাবদ্ধতার কারণে আমার পক্ষে সারা বাংলাদেশের চিত্র জানা তখন সম্ভব ছিল না।

[১] অনেকে বলতে পারেন একটি প্রতিযোগীতামূলক বাজারে পণ্যমূল্য তো ঠিক হয় বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করেই এবং একজন উৎপাদককে সেই মূল্য অনুযায়ীই পণ্য বিক্রি করতে হয়। অর্থনৈতিক পরিভাষায় একে বলা হয় Price Takers' Market। হ্যা। একথা ঠিক। একটি বাজারে যদি শত শত উৎপাদক থাকেন এবং একই সাথে অনেক ক্রেতা থাকেন তবে সেই বাজার মূল্য ঠিক হয় চাহিদা এবং যোগানের যুগপত ক্রিয়ার মাধ্যমে।পণ্যের উৎপাদন খরচ যদি বেড়ে যায়, তাহলে সকল উৎপাদক একই পরিমাণে মূল্য বাড়িয়ে দেয়। ফলে বাজার মূল্য কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের শস্যের বাজারকে পুরোপুরি প্রতিযোগীতামূলক বাজার বলা যায় কিনা সেই ব্যাপারে আমার প্রশ্ন রয়েছে। এখানে প্রচুর সংখ্যক কৃষক রয়েছেন, রয়েছেন প্রচুর সংখ্যক ভোক্তাও। কিন্তু তাদের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই এই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা প্রচুর ক্ষমতার মালিক। তাই শস্যের বাজারের মূল্য নির্ধারণে এই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা অত্যধিক।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এর সুযোগ চলে আসে পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই। সুযোগটি দিয়ে দেন চ্যানেল আইয়ের হৃদয়ে মাটি ও মানুষের উপস্থাপক মি. শাইখ সিরাজ।

আমি তখন সবেমাত্র জেদ্দায় এসেছি। নতুন বাসা নিয়েছি। কিনেছি নতুন টিভি।

একদিন টিভি দেখছি। চ্যানেল চেইঞ্জ করতে করতে চ্যানেল আইয়ে দেখলাম হৃদয়ে মাটি ও মানুষ দেখাচ্ছে। অনুষ্ঠানটি আমার নিয়মিত দেখা হয়না সময় স্বল্পতার কারণে। তবে মি. শাইখ সিরাজ যে এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক কৃষকদেরকে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের ড্রয়িং রুমে নিয়ে এসেছেন এবং তাতে যে সারা দেশে কৃষক এবং কৃষিকাজ নিয়ে একটি ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে, এর জন্য এই অনুষ্ঠানটির প্রতি আমার দুর্বলতা অনেক আগে থেকেই ছিল।

ঐদিন দেখলাম মি. শাইখ সিরাজ কৃষকদের শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিয়ে একটি রিপোর্ট করছেন। বিষয়টি আমার গবেষণা এবং উৎসাহের সাথে মিলে যাওয়ায় আমি অনুষ্ঠানটি দেখা শুরু করলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম মি. শাইখ সিরাজও একই ধারায় চিন্তাভাবনা করছেন। কৃষকদের শস্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারলে দেশের সর্বত্র যে এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হবে, সেই ব্যাপারে তিনিও একমত। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি শস্যের ন্যায্যমূল্য না পাবার যে সকল কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন, তা আমার জরিপ ফলাফলের সাথেও অনেকখানি মিলে যাচ্ছে।

এর পরবর্তীতে আমি হৃদয়ে মাটি ও মানুষের আরো কয়েকটি পর্ব দেখেছি। মি. শাইখ সিরাজ এই বিষয়টির উপর আরো বেশ কয়েকটি পর্ব করেছিলেন। আমি বুঝতে পারি, এই সমস্যাটি মোটামুটি সারা দেশজুড়েই। তাই আমার সারা দেশব্যাপী জরিপ না করার যে দুর্বলতা ছিল, তা অনেকখানিই কেটে যায় মি. শাইখ সিরাজের কল্যাণে।

মি. সিরাজ শুধু দেশের রিপোর্ট করেই বসে থাকেননি। তিনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য দেশে গিয়েও রিপোর্ট করেছেন। অন্যান্য দেশগুলোতে কৃষকরা কিভাবে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে, সে ব্যাপারেও তিনি বেশ কয়েকটি পর্ব প্রচার করেছিলেন।

তবে মি. শাইখ সিরাজের শস্যের ন্যায্যমূল্য না পাবার কারণগুলো প্রায় ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলেও এর সমাধান কিভাবে হতে পারে, সেই ব্যাপারে তিনি খুব বেশি আলোকপাত করেননি। তিনি এক ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কিভাবে হবে, সেই কাজটি কোথা থেকে শুরু করতে হবে, সেই ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি।

তবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

মি. শাইখ সিরাজ একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কোন গবেষক নন। তার কাজ হল একটি সমস্যা মিডিয়াতে তুলে এনে সর্বএ সচেতনতার সৃষ্টি করা। আর এই সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার মুলে গিয়ে সমস্যাটির সমাধানের প্রস্তাব করার দায়িত্ব গবেষকদের। তাই আমি মনে করি মি. শাইখ সিরাজ তার দায়িত্ব পালনে শতভাগ সফল।

কোন একটি সমস্যার সমাধানের জন্য শুধু কারণ চিহ্নিতকরণই যথেষ্ট নয়। সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্যাটির কারণগুলো চিহ্নিত করে এর সমাধানের পথ বাতলে দিতে হবে একটি মডেলের আকারে। আবার শুধু মডেল তৈরি করলেই হবে না। এই মডেলটি বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। না হলে শুধু শুধু মডেল বানিয়ে কোন লাভ নেই।

যাইহোক, এর পরবর্তীতে আমি গবেষণাটি করার তেমন কোন সুযোগ পাইনি। তবে দৈনন্দিন কাজের ফাকে আমি বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন সূএ থেকে গবেষণা পেপার যোগাড় করেছি বিগত চার বছর যাবত। আমার পরিকল্পনা ছিল সময় হলে আমি গবেষণাটি করে একটি পেপার তৈরি করব এবং তা একটি জার্নালে ছাপাব। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে দেশের মানুষকে জানানোর জন্য আমি বাংলাদেশের পএিকায় লিখব।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বাজারে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে আমি গবেষণাটি শুরু করার ব্যাপারে আগ্রহী হই। গবেষণাটি শুরু করার পর এর জন্য আমাকে প্রচুর গবেষনা পেপার পড়তে হয়েছে।

পেপারগুলো পড়ার পর আমার মডেলটি আরো শক্তিশালী হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগে মডেলটি নিয়ে আমি যেভাবে চিন্তা করতাম, তারও বিবর্তন হয়েছে অনেক। আমি এটাও দেখেছি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের মডেল রয়েছে যা আমার প্রস্তাবিত

মডেলের কাছাকছি। ফলে *কুটিরের* সেই সাধারণ ব্যবসায়িক মডেলটি এখন একটি বৃহৎ অথচ বাস্তবায়নযোগ্য *দারিদ্র্য বিমোচন মডেলে* পরিণত হয়েছে।

এই রিপোর্ট লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল শ্রেণী এবং পেশার পাঠকদেরকে এই মডেলটির খুঁটিনাটি দিকগুলো সহজ ভাষায় বোঝানো। তাই সঙ্গত কারণেই আমি গবেষণা পেপার লেখার সনাতন স্টাইল এই পেপারটিতে অনুসরণ করিনি।

এই পেপারটিতে কৃষকদের ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তির পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত যে সমস্যা তারও একটি সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি চেষ্টা করেছি এই পেপারটিকে যথাসম্ভব ছোট করার। তবে পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝবেন, দারিদ্র্যের মত একটি বৃহৎ, গভীর, এবং জটিল বিষয়কে অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

তাই আমি আশা করব, যারা এই সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী, তারা পেপারটি ধৈর্য এবং আগ্রহের সাথে পড়বেন। আর যারা সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী নন, তাদেরকে আগেই বলে দিচ্ছি, এই বিশাল পেপার পড়ার ধৈর্য আপনাদের না-ও থাকতে পারে। তাই পেপারের অর্ধেক পড়েই যারা ফেলে দিবেন তারা দয়া করে আমাকে দোষ দিবেন না।

২. প্রাসঙ্গিক কিছু ধারণা

তবে মডেলটির গভীরে যাওয়ার আগে পাঠকদেরকে প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক কিছু কনসেপ্টের সাথে পরিচিত করানো দরকার। কনসেপ্টগুলো হলঃ ঈবঃবৎরং চধৎরনঁং, গধৎশবঃ ঊভভরপরবহপু, গধৎশবঃ ওহঃবমৎধঃরড়হ এবং ঝঃড়পশ গধৎশবঃ ঞৎধফরহম গবপযধহরংস ধহফ ঃযব জড়ষব ড়ভ গধৎশবঃ ঝঢ়বপরধষরংঃং। আমি ধারণাগুলি একে একে আপনাদেরকে বলছি।

Ceteris Paribus

Ceteris Paribus এর অর্থ হল All Other Things Remaining the Same বা অন্যান্য সকল বিষয় একইরকম আছে। এই ব্যাপারটি কি তা বোঝানোর জন্য আমি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি।

ধরা যাক, একটি পরিবারে তিনজন আয় করছেন। বাবা আয় করছেন মাসিক ২০,০০০ টাকা, বড় ছেলে আয় করছে মাসিক ১০,০০০ টাকা এবং ছোট ছেলে আয় করছে মাসিক ৫,০০০ টাকা। পরিবারে মা এবং এক মেয়েও রয়েছে। তারা কোন আয় করছেন না।

এখন কেউ হঠাৎ বলে উঠল, বাবার আয় যদি ২০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক ৩০,০০০ টাকা করা যায়, তাহলে পরিবারের আয় বাড়বে এবং জীবনমানের উন্নতি হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দাবিটি ঠিক কিনা?

না, এটি ঠিক নয়।

এর কারণ বাবার আয় না হয় বাড়ানো হল, কিন্তু একইসাথে যদি বড় ছেলের আয় কমে যায়, ছোট ছেলে মারা যায়, এবং সেইসাথে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায়, তাহলে পরিবারের আয় বাড়বে না, বরং কমেও যেতে পারে। তাই জীবনমানের উন্নতির জন্য শুধুমাত্র বাবার আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। বাবার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য সকল বিষয় অন্তত আগের মতোই থাকতে হবে।

তাই বলতে হবে, বাবার আয় যদি ২০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক ৩০,০০০ টাকা করা যায়, Ceteris Paribus, তাহলে পরিবারের আয় বাড়বে এবং জীবনমানের উন্নতি হবে।

এখানে ধরে নেয়া হয়েছে বড় ছেলে আগের মতোই মাসিক ১০,০০০ টাকা আয় করছে, ছোট ছেলে মাসিক ৫,০০০ টাকা আয় করছে, এবং জীবনযাএার ব্যয়ও আগের মতোই আছে। ফলে বাবার আয় বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের মোট আয় বেড়েছে এবং জীবনমানের উন্নতি হয়েছে।

Market Efficiency

একটি বাজার তখনই Efficient হবে যখন এর পণ্য স্থানান্তরে খরচ হবে সবচেয়ে কম, তথ্যের আদান প্রদান হবে অবাধ, উৎপাদক সবচেয়ে আকর্ষণীয় মূল্যে তার পণ্য বিক্রয় করতে পারবে, মধ্যস্বত্বভোগী যারা আছে তারা খুব কম লাভ করবে, এবং ভোক্তা একটি মানসম্পন্ন পণ্য পাবে ন্যায্যমূল্যে[২]।

মুক্তবাজার অর্থনৈতিক তত্বে ধরে নেয়া হয়, বাজার কাঠামোতে যদি কোন প্রকার সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তথ্যের আদান প্রদান যদি সুষমভাবে হতে থাকে, তাহলে যে কোন বাজার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে Efficient হতে থাকবে। ফলে ভোক্তা এবং পণ্য উৎপাদকের মধ্যে দুরত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে।

অনেকের হয়তো মনে আছে আমাদের দেশে এমন একটি সময় ছিল, যখন শস্যের পুরো বাজার ছিল অনেকটাই সরকারের নিয়ন্ত্রনে। শস্য কাটার মৌসুম শুরু হলে সরকার একটি নির্দিষ্ট দামে কৃষকের কাছ থেকে শস্য কিনে নিত। সেই শস্য আবার গুদামজাত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে[৩] জনগণের কাছে বিক্রি করতো। এর জন্য তৈরি করা হয়েছিল কসকরের মত প্রতিষ্ঠান এবং রেশন কার্ডের মতো ব্যবস্থা। তখনকার দিনে কৃষকের বীজ, সার প্রর্ভৃতি কাচামালের বাজারও ছিল সম্পূর্ণ সরকারের হাতে।

এই ধরণের একটি নীতির উদ্দেশ্য ছিল জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জনগণকে ন্যায্যমূল্যে শস্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়

[২] ন্যায্যমুল্য মানেই কম মুল্য নয়। চাহিদা এবং যোগানের যুগপত ক্রিয়ার মাধ্যমে যে মুল্য ঠিক হয়, তাই ন্যায্যমুল্য। এই মুল্য বেশিও হতে পারে, আবার কমও হতে পারে।

[৩] ন্যায্যমুল্য বলা হলেও এটা ছিল মুলতঃ প্রকৃত বাজার মুল্যের চেয়ে কম মুল্যে শস্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এতে কৃষকের স্বার্থ যতটা না বিবেচনায় আনা হতো, তার চেয়েও বেশি বিবেচনায় আনা হতো ভোক্তার স্বার্থ। কারণ সমাজের নিম্নবিও শ্রেণীর পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা নের্তৃত্ব দিতেন তাদের কেউই কৃষক ছিলেন না, ছিলেন ভোক্তা। ফলে এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তার স্বার্থই সবচেয়ে বেশি দেখা হতো।

এই ধরণের সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে দুর্নীতি বাড়ছে, বাড়ছে অব্যবস্থা। ফলে জনগণ কম দামে পণ্য পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর জন্য সরকারের যে খরচ হচ্ছে, তা দিয়ে সরকারের কাছে আর কোন টাকা থাকছে না। ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে।

তাই মুক্তবাজারের প্রবক্তারা এবং বহুজাতিক দাতাসংস্থাগুলো সরকারগুলোর এই ধরণের নীতির বিরোধীতা করতে থাকেন। তারা বলতে থাকেন, শস্যের বাজারে যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমানো যায়, এবং শস্যের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেয়া যায়, তাহলে বাজার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে Efficient হতে থাকবে। ফলে লাভবান হবে কৃষক, ভোক্তাসহ সকল মানুষ। ফলে সরকারের বেঁচে যাওয়া টাকা তখন ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে।

দাতা সংস্থাগুলোর এই ধরণের মতামতের তাত্বিক ভিত্তি ছিল। সেই মতামতের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনেক দেশ শস্যের বাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমাতে থাকে। ফলে সার, বীজ, কীটনাশক সহ সকল পণ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় এবং শস্যের বিপণন এবং আমদানীতে ব্যক্তিখাতকে যুক্ত করা হয়। এর কারণে কমে যায় টিসিবির মতো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং উঠে যায় রেশন ব্যবস্থা। এতে আশা করা হয়েছিল যে এই নীতির মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থা আরো সুষম এবং গতিশীল হবে এবং বাজার ধীরে ধীরে Efficient হতে থাকবে।

Market Integration

একটি বাজারকে তখনই Perfectly Integrated বলা হবে যখন উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে পণ্যের সময়মত স্থানান্তর ঘটবে। অর্থাৎ এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না যে রংপুরে চাল উদ্বৃত্ত পড়ে আছে, অথচ সিলেটে ১০০ টাকা দিয়েও এক কেজি চাল পাওয়া যাচ্ছেনা।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির তত্ব অনুযায়ী ধরে নেয়া হয়, বাজারে যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমানো হয়, এবং বাজারকে নিজের মতো করে চলতে দেয়া হয়, তাহলে বাজার ধীরে ধীরে Integrated হতে থাকবে, এবং উপরে যে পরিস্থিতি বলা হল, তার কখনো উদ্ভব হবে না।

তথ্যের সুষম আদান প্রদান Market Integration এর একটি নিয়ামক। তথ্যের আদান প্রদানে যদি কোন প্রকার বিধিনিষেধ বা সমস্যা না থাকে, তাহলে বাজার ধীরে ধীরে Perfectly Integrated হতে থাকে।

Stock Market Trading Mechanism and the Role of Market Specialists

একটি আধুনিক স্টক মার্কেট কিভাবে পরিচালিত হয়, সে ব্যাপারে পাঠকদেরকে একটু প্রাসঙ্গিক ধারণা দেয়া যাক।

একটি স্টক মার্কেটে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন হয়। এই শেয়ারগুলো ছাড়ে বিভিন্ন কোম্পানী এবং এগুলো কিনে নেয় বিভিন্ন বিনিয়োগকারী। এখানে বিনিয়োগকারীকে ভোক্তা এবং কোম্পানীকে উৎপাদক এবং শেয়ার সার্টিফিকেটকে একটি পণ্যের সাথে তুলনা করা যায়।

একটি স্টক মার্কেটে একজন বিনিয়োগকারী চাইলে ৫০ টি শেয়ারও কিনতে পারেন, আবার ৫০,০০০ শেয়ারও কিনতে পারেন। অর্থাৎ একটি স্টক মার্কেট শেয়ার লেনদেনের জন্য পাইকারী এবং খুচরা উভয় বাজারই।

কিন্তু কোন স্টক মার্কেটে যদি এমন নিয়ম থাকতো যে একজন বিনিয়োগকারী ১০,০০০ শেয়ারের নীচে কোন শেয়ার কিনতে পারবেন না, তাহলে এই স্টক মার্কেটই হয়ে যেত শেয়ারের পাইকারী বাজার। এই পাইকারী বাজার হতে শেয়ার কিনে নিয়ে ছোট আকারে আবারো বিক্রি করার জন্য খুচরা শেয়ার বিক্রেতার উদ্ভব হতো এবং ছোট বিনিয়োগকারীদেরকে সেই সকল খুচরা বাজার থেকে খুচরা শেয়ার কিনতে হতো। ফলে শেয়ারের পাইকারী এবং খুচরা বাজারে শেয়ারের মূল্যের তারতম্য হতো।

কিন্তু এই ব্যাপারটি ঘটছে না কারণ একটি স্টক মার্কেট শেয়ার লেনদেনের জন্য পাইকারী এবং খুচরা উভয় বাজারই।

একটি আধুনিক স্টক মার্কেটে বিনিয়োগকারী, কোম্পানী, এবং স্টক ব্রোকাররা ছাড়াও Market Specialist বলে আরেক ধরণের কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন যারা বাজারের মূল্য পরিস্থিতির দিকে চোখ রাখেন।

এদের দায়িত্ব হল বাজারকে সঠিক দিকে চালিত করা, বাজারকে অতিমূল্যায়নের হাত হতে রক্ষা করা, এবং বাজার অতিরিক্ত নেমে গেলে তা সময়মতো উঠানো। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা নিজেদের টাকা দিয়ে শেয়ার লেনদেন করেন এবং এর থেকে যা লাভ হয়, তা দিয়ে তারা চলেন। একটি আধুনিক স্টক

মার্কেটে এই ধরণের Market Specialist তৈরি করার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয় এবং এরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে থাকেন।

উপরে যে চারটি বিষয়ের অবতারণা করা হল, তা আমাদেরকে মডেলটি বুঝতে সাহায্য করবে। এখন মুল মডেলটি আলোচনার আগে দারিদ্র্যের কারণ এবং বাংলাদেশের বর্তমান বাজার ব্যবস্থার এুটি বোঝার জন্য আপনাদেরকে কাশেম মিঞা এবং সোলেমানের গল্প শুনতে হবে। এখানে বলা দরকার, এই গল্পটি কোন নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে করা হয়নি। বরং বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের কৃষিখাতের, বিশেষ করে শস্যের বাজার ব্যবস্থায় যে সকল সমস্যা ফুটে উঠেছে, তাই তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে এই গল্পের মাধ্যমে।

৩. কাশেম মিঞা এবং সোলেমানের গল্প

কাশেম মিঞার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি নিভৃত গ্রামে তার বসবাস। স্ত্রী, তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে তার মোটামুটি বড় একটি সংসার। বড় ছেলে স্কুলে পড়তো, কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে। সে এখন বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করে।

কাশেম মিঞার খুবই সামান্য পরিমাণ জমি। এই জমি তিনি পেয়েছেন তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে। তার বাবা রহিম মিঞা কিছু জমি রেখে মারা যান প্রায় আশি বছর বয়সে। মারা যাওয়ার আগে তিনি তার জমি তিন ছেলের কাছে ভাগ করে দিয়ে যান।

কাশেম মিঞার বাবা রহিম মিঞার আর্থিক অবস্থা একেবারে খারাপ ছিল না। কিন্তু দুর্যোগ আসে অনেকটা হঠাৎ করেই। সর্বনাশা যমুনার অব্যাহত ভাঙ্গনের কবলে পড়ে রহিম মিঞা তার জমিজমার অনেকটাই হারিয়ে বসেন। ফলে তিনি যখন মারা যান, তখন ছেলেদেরকে দেয়ার মতো খুব বেশি জমি তার ছিল না।

কাশেম মিঞা রহিম মিঞার মেঝ ছেলে। তার বড় ছেলের নাম সিদ্দিক মিঞা। ছোটটির নাম আক্কাস।

সিদ্দিক মিঞার আর্থিক অবস্থা তুলনামুলক অনেক ভাল। স্ত্রী এবং তিন ছেলে নিয়ে তার সংসার। বড় ছেলে বালেগ হয়েছে। সে এখন বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করা ছাড়াও টুকটাক ব্যবসাপাতি করে। তাই পরিবারের আয় বেড়েছে।

বড় ছেলে হিসাবে পুরো পরিবারের উপর যে দায়িত্ব ছিল, তার কতটুকু সিদ্দিক মিঞা পালন করেছে, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কারণ আর্থিক অবস্থা ভাল হলেও তার এই অবস্থান যেন কাশেম মিঞার জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিদ্দিক মিঞা কাশেম মিঞার জমিটা দখল করে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে অনেক দিন হল। সিদ্দিক মিঞার দাবি তার বাবা নাকি মারা যাওয়ার আগে মৌখিকভাবে তাকে এই জমিটি দান করেছেন। তাই এই জমির প্রকৃত বৈধ মালিক সিদ্দিক মিঞা, কাশেম মিঞা নয়। সিদ্দিক মিঞার সাথে যুক্ত হয়েছে তারই

বালেগ পুএ আলখাস। তারা প্রচারণা চালাচ্ছে কাশেম মিঞা নাকি অবৈধভাবে তাদের জমি দখল করে বসে আছেন।

কাশেম মিঞা শুনেছেন সিদ্দিক মিঞা নাকি নকল দলিল করে তার বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই গুজব যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কাশেম মিঞার কপালে দুঃখ আছে। কারণ কোর্ট কাচারীর যে খরচ, তা দিয়ে কাশেম মিঞা সিদ্দিক মিঞার সাথে মামলায় পেরে উঠবেন না। তিনি এই চিন্তায় এখন আর রাতে ঘুমাতে পারেন না। সামান্য জমিটাও যদি বেহাত হয়ে যায়, তাহলে তিনি কি করবেন, কোথায় যাবেন? এতো বড় পরিবার কি খাবে, কি করবে?

কাশেম মিঞা এর জন্য শুধু সিদ্দিক মিঞাকে দায়ী করেন না। দায়ী করেন নিজের স্ত্রী হালিমাকেও। কাশেম মিঞার দাবী তার শ্বশুর যদি তার বিয়ের সময় কিছু জমি কাশেম মিঞাকে লিখে দিতেন, তাহলে কাশেম মিঞার আজকের এই খারাপ অবস্থা হতো না। এই কারণে কাশেম মিঞা সময় সময় হালিমাকে মারধরও করেন।

কাশেম মিঞার এখন পরিকল্পনা তার ছেলেকে যদি একটি ভাল বিয়ে দিয়ে যৌতুক হিসাবে কিছু পাওয়া যায়, তাহলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। কাশেম মিঞার আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও গ্রামে তার বংশের কিছুটা সুনাম রয়েছে। তাই এই বংশমর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে ছেলেকে একটি ভাল ঘরে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন কাশেম মিঞা।

কাশেম মিঞার এই দারিদ্র্যের কারণে তার নিজের স্বাস্থ্যেরও যেমন অবনতি হচ্ছে তেমনি পরিবারের সকল সদস্যদেরও পড়তে হচ্ছে নতুন নতুন দুর্যোগের মুখে। টাকার অভাবে কাশেম মিঞাকে অতীতে দুটি সন্তানকে হারাতে হয়েছে অল্প বয়সে। আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে তার স্ত্রী হালিমা একই সাথে দুটি জমজ সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু জন্মের পরই সন্তান দুটির দেখা দেয় বিভিন্ন রোগ ব্যাধি। সেইসাথে হালিমারও শরীরের অবস্থা খারাপ হতে থাকে দিন দিন।

অবশেষে জমজ সন্তান দুটি মারা যায় ডায়রিয়াতে। কাশেম মিঞার তখন যে কি দুর্যোগ গেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। টাকার অভাবে তিনি সন্তানদের চিকিৎসা করাবেন, নাকি হালিমার দেখভাল করবেন, তা নিয়ে তিনি ছিলেন খুবই চিন্তিত। গ্রামে তখন কোন হাসপাতালও ছিল না যে তিনি ডাক্তার দেখাবেন। তাই শেষ ভরসা ছিল আলিম কবিরাজ। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি।

অভাবের তাড়নায় তার বড় সন্তানটিও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেনি। সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল বটে, তবে বিভিন্নমুখী আর্থিক চাপের কারণে কাশেম মিঞা তাকে কৃষি কাজে লাগাতে বাধ্য হয়েছেন।

অন্যদিকে কাশেম মিঞার ছোট ভাই আক্কাস আজ আর বেঁচে নেই। সে বিয়ে করার পরই ঢাকায় চলে যায়। শোনা যায় সে নাকি সেখানে রিক্সা চালাতো। তার যে জমি রয়েছে তা সে বর্গা দিয়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। বর্গার মাধ্যমে তিনভাগের একভাগ শস্য সে পেত।

তার মতে, কৃষিকাজ করে যে আয় হয় তা দিয়ে তার পোষাবে না। তাই নিজে আর কৃষিকাজ করে সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই। এই কারণে বাড়তি আয়ের জন্য সে পাড়ি জমায় ঢাকাতে। সেখানে রিক্সা চালিয়ে মোটামুটি ভালই আয় করছিল সে। সঞ্চয়ও বেশ ভাল হচ্ছিল। বাড়িতে ছিল বউ এবং দুই মেয়ে, এক ছেলে।

কিন্তু হঠাৎ করেই সংবাদ আসে ঢাকায় ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে আক্কাস। এই সংবাদে তার ছোট ছিমছাম পরিবারের উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তার বউ রেহানা যেন কোন কুলকিনারা পায়না সে এখন কি করবে। বর্গা দিয়ে যে ধান আসে তা দিয়ে পুরো সংসারের এক বছরও চলে না।

তাই রেহানা এখন একটি গৃহস্থতে ঝি এর কাজ করে। সেইসাথে সে চেষ্টা করছে কোন প্রকার ঋণ নিয়ে কোন নতুন ব্যবসা শুরু করা যায় কিনা। সামান্য যে আয় হয় তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে যায় তার।

সিদ্দিক মিঞা কাশেম মিঞার জমির দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিলেও রেহানার জমি নিয়ে কোন প্রকার লোভ করেনি। বরং সে রেহানার দুঃখের দিনে টাকা পয়সা দিয়ে তাকে বেশ সাহায্যও করেছে। তাই সিদ্দিক মিঞার সাথে কাশেম মিঞার এই জমি সংক্রান্ত ঝগড়াঝাটিতে রেহানা সিদ্দিক মিঞার পক্ষে। এই কারণে কাশেম মিঞা রেহানাকে দুই চোখে দেখতে পারেন না।

ফসল তোলার মৌসুম শুরু হয়েছে। কাশেম মিঞার জমিতে যে পরিমাণ ধান হয় তা দিয়ে তার বড় পরিবারের পুরো বছরের চাহিদা মেটে না। তারপরও তিনি কিছু ধান বিক্রির জন্য আলাদা রাখেন। কারণ পরিবার চালানোর জন্য তাকে নগদ অর্থ সঙ্গে রাখতে হয়। সেইসাথে ফসল কাটার মৌসুম শুরু হলেই দেখা

যাবে মহাজনদের আনাগোনা। তারা তখন তাদের ঋণের টাকা সুদে আসলে ফেরত চাইবে। তাই প্রয়োজন নগদ অর্থ।

এইবার তিনি জমিতে যে ধান চাষ করেছেন তার জন্য তার খরচ হয়েছে প্রায় কয়েক হাজার টাকা। এই টাকার এক বড় অংশ তিনি ঋণ নিয়েছেন এক গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে।

বিগত বছরের তুলনায় সার এবং কীটনাশকের দাম বেড়েছে অনেক। গত বছর সার কিনতে যা খরচ হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করেও সেই সার তিনি এখন আর পাচ্ছেন না। অথচ সরকারের এমপিরা বলছে, সরকার নাকি এবার সারে ভর্তুকি বাড়িয়েছে।

ভর্তুকি বাড়ালে সারের দাম বাড়ে কেন, এই হিসাব কাশেম মিঞা সহ আরো অনেক কৃষকের মাথায় ঢোকেনা। তারা নিজেরা বলাবলি করে, এই সারের ভর্তুকির টাকা সবই খেয়ে ফেলে সরকারের এমপি, দলের লোক, আর মন্ত্রী-মিনিস্টাররা।

গত কয়েকদিন আগে শহর থেকে এক মন্ত্রী এসে দাবী করলেন সরকার এবার কয়েক হাজার কোটি টাকা নাকি সারে ভর্তুকি বাড়িয়েছে। তার চলে যাওয়ার পর স্থানীয় দলের লোকেরাও একই দাবী করতে থাকল।

এরপর একসময় কাশেম মিঞা আরো কয়েকজন কৃষককে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন আব্দুর রহিমের ঘরে। আব্দুর রহিম সরকারী দলের রাজনীতি করলেও সে কাছেরই লোক। তাই তাকে নিয়ে কাশেম মিঞাদের খুব একটা ভয়ডর নেই। তারা আব্দুর রহিমকে সবাই মিলে জিজ্ঞেস করে, সরকার যদি সত্যি সত্যি সারে ভর্তুকি বাড়ায় তাহলে তারা এখন সার পাচ্ছেন না কেন? আর ভর্তুকিও বা গেল কোথায়? সারের দাম তাহলে গত বছরের তুলনায় বেড়ে গেল কেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আব্দুর রহিমের কাছেও নেই। তাই সে হিঃ হিঃ করে হেসে বলে, *আরে সব ভর্তুকি যদি হেরাই খ্যাইয়া ফেলায়, আমরা তাইলে পামু কি?*

এই সকল প্রশ্ন কৃষকরা আরো বড় রাজনীতিবিদদেরকে করতে ভয় পায়। কারণ তারা দেখেছে যে যতো বড় রাজনীতিবিদ, সে ততো বেশি দাপুটে। তার বিরুদ্ধে কথা বললেই শেষ।

তবে লাঠির বাড়ি মারলেও এই সকল এমপি, রাজনীতিবিদরা একেবারেই যে গ্রামের জন্য কাজ করে না, তা ঠিক নয়। যেমন এবারের এমপি কাজী সোবহান নান্টুর কথাই ধরা যাক। বিগত দশ বছরে তিনি গ্রামে বেশ কয়েকটি পুকুর খুদিয়েছেন, একটি রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। নিজের মায়ের নামে তৈরি করেছেন একটি স্কুল।

তার টাকা আর প্রতিপত্তিকে টেক্কা দেয়ার মতো কোন নেতা এই আসনে নেই। তাই তিনি বারবারই জিতে আসছেন।

সার এবং কীটনাশকের এই উচ্চমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যতার মাঝেও কাশেম মিঞার মতো কৃষকরা কৃষিকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার কৃষিকাজ ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে রিক্সা চালিয়ে বাড়তি আয় করার জন্য। ইদানিং আশেপাশের গ্রামগুলিতে বিদেশ যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। কৃষকরা জমিটমি বিক্রি করে দালাল ধরে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছে। কাশেম মিঞাদের গ্রামটি একটি গন্ডগ্রাম হওয়ার কারণে এখানে এই হিড়িকটি এখনো লাগেনি।

তবে কাশেম মিঞারা বিদেশ যাওয়ার এই প্রবণতা এবং সম্ভাবনা নিয়ে প্রায়ই আলাপ আলোচনা করেন। বিদেশ যেতে নাকি লাগে প্রায় তিন লাখ টাকা। আর বিদেশে গিয়ে যে আয় হয় তা দিয়ে নাকি মাএ এক বছরের মধ্যেই টাকা ফেরত দিয়ে দেয়া যায়। এরপরে যে টাকা থাকবে, তার সবই নিজের।

বিদেশ গিয়ে এরই মধ্যে পাশের গ্রামের অনেকেই নিজেদের ভাগ্য বদল করে ফেলেছে। তারা পাকা ঘর করেছে। তাদের সন্তানরা লেখাপড়া করছে। কাশেম মিঞারা এই সকল কথা লোকমুখে শুনেছেন। কিন্তু এই সাফল্যগুলি নিজের চোখে তাদের এখনো দেখা হয়নি।

কাশেম মিঞা ফসল কেটে ফেলেছেন। তিনি হিসাব করে বের করে ফেললেন, এইবার কত মন ধান তিনি নিজে রাখবেন, আর কতো মন বিক্রি করবেন। তাকে ধান বিক্রি করতে হয় কিছুটা দুরবর্তী একটি হাটে গিয়ে। সেই হাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে ভ্যান ভাড়া গুনতে হয় প্রায় ১০০ টাকা।

ফসল কাটার মৌসুমে এই হাটেই ধান কেনা বেচা হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফড়িয়ারা আসে ধান কেনার জন্য। তবে ফসল উঠার সময় এই হাটে সকালে

গিয়ে লাভ নেই। কারণ সকাল বেলা ফড়িয়ারা আসেনা। বেলা বাড়তে থাকলে কোথা থেকে তারা যেন একের পর এক উদয় হয়।

এই ফড়িয়ারা প্রায় সকলেই সুন্দর আলীর চাতালের লোক। সুন্দর আলী চাতাল তৈরি করেছেন আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। তিনি মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর হল। তার চাতাল এখন চালাচ্ছে তার ছেলে সোলেমান। আশেপাশে আরো চাতাল থাকলেও সুন্দর আলীর মতো এতো বৃহৎ চাতাল আশেপাশে কোথাও নেই। সুন্দর আলীর চাতালের ফড়িয়াদের কাছে ধান বিক্রি করলে মনপ্রতি কিছু টাকা বেশিও পাওয়া যায়।

তাই বাজারে ধানের যে দাম ওঠে তা মূলত ঠিক করে সুন্দর আলীর পুত্র সোলেমানই। সুন্দর আলীর ফড়িয়ারা সকলেই কমবেশি গ্রামের অবস্থা জানে। তারা জানে কোন কৃষক গরীব, আর কোন কৃষক অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। শুধু তাই নয়, ফড়িয়ারা একজন কৃষকের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে কে ঠেকায় আছে, আর কে নেই।

কৃষকদের এই অবস্থান পুরোপুরিই কাজে লাগায় সুন্দর আলীর ফড়িয়ারা। কারণ তারা জানে কৃষককে এই ধান বিক্রি করতে হবে, এবং তা আজই। কারণ আজকে যদি কাশেম মিঞার মতো কৃষকরা ধান বিক্রি করতে না পারেন, তাহলে তাদেরকে আরো ১০০ টাকা ভ্যান ভাড়া দিয়ে ধানগুলো আবারো ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

তাই বেলা যতো বাড়তে থাকে, ফড়িয়াদের অবস্থান ততো শক্তিশালী হতে থাকে, আর দুর্বল হতে থাকে কাশেম মিঞাদের অবস্থান। কারণ ধান বিক্রি করতে করতে যদি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তাহলে দেখা দেবে আরেক বিপদ। গ্রামে রাতের বেলায় টাকাপয়সা নিয়ে হাটাচলা করা নিরাপদ নয়। তাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে যাবার অনেক আগেই অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন ফড়িয়ারা যে দাম বলছে সেই দামেই বিক্রি করে দিতে হয় তাদের ধান।

তবে সোলেমানের মতো ব্যবসায়ীরা ধানের এই মূল্য কিভাবে ঠিক করে সেই সম্পর্কে কাশেম মিঞাদের কোন ধারণা নেই। তাদের ধারণা নিয়েও কোন লাভ নেই। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর না নিলেও চলবে।

কাশেম মিঞারা জানেন না বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় বাজারে একটি শস্যের চাহিদা কেমন সেই তথ্যটি একজন খুচরা ব্যবসায়ী জানিয়ে দেয় আড়তদারকে। আড়তদার সেই মতো অর্ডার দেয় সোলেমানদেরকে।

যেহেতু সোলেমানরা তাদের বিশাল গুদামে চাল মজুদ করে রেখেছে, সেহেতু সেই তথ্য অনুসারে তারা তাদের মূল্য নির্ধারণ করে। সোলেমানদের ব্যবসাতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই তারা অর্ডারের প্রবণতা দেখেই বুঝতে পারে চালের চাহিদা তার মজুদের তুলনায় বেশি না কম। চাহিদা বেশি হলে তারা তাদের চালের মূল্য ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকে[৪]।

ফসল কাটার সময় বাজারে চালের দাম কম থাকে। কিন্তু যতোই দিন যেতে থাকে ততোই দাম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কারণ সোলেমানরা জানে আগামী মৌসুম না আসা পর্যন্ত নতুন ধান বাজারে উঠবে না। আর কৃষকের যে ধান উদ্বৃও ছিল তাতো সোলেমানরাই কিনে নিয়েছে।

তবে পরবর্তী ফসল কাটার সময় এগিয়ে আসতে থাকলে সোলেমান তার মজুদকৃত চালের মূল্য আস্তে আস্তে কমাতে থাকে। কারণ ততোদিনে সোলেমান মজুদকৃত চাল বিক্রি করে তার বিনিয়োগের পুরোটাই লাভ সহ তুলে আনতে পেরেছে। তাই তার গুদামে যে সামান্য পরিমাণ চাল অবশিষ্ট থাকে, তা কম দামে ছেড়ে দিলেও তার কোন ক্ষতি নেই।

সোলেমানের মতো অন্যান্য বৃহৎ চালকল মালিকরাও একই কৌশল অবলম্বন করে। এতে বেশ কয়েকটি লাভ হয়। প্রথমত, এর ফলে তাদের গুদাম খালি হয়ে যায়। ফলে পরবর্তী শস্য বাজারে উঠলে তাদের গুদামে তা রাখতে কোন সমস্যা হয় না। দ্বিতীয়ত, চালের দাম কম রাখাতে বাজারে ধানের মূল্য পড়ে যায় অনেক। ফলে কৃষকের কাছ থেকে বাজার মূল্যের দোহাই দিয়ে অনেক কম দামে নতুন ধান কেনা যায়[৫]।

বাজারে চালের মূল্য নির্ধারণে সোলেমানদের দাপট তাই একচেটিয়া। এখানে শহুরে আড়তদাররা খুব বেশি মূল্যের হেরফের করতে পারে না। কারণ তাদের মজুদ সোলেমানদের মজুদের চেয়ে অনেক কম। এর কারণ শহরে জমির দাম অনেক বেশি, এবং যে কেউ চাইলেই একটি বড় গুদাম তৈরি করতে পারে না।

[৪] **খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে দ্রব্যমুল্য কিভাবে বাড়ে-কমে, তার একটি ধারণা দেয়া হয়েছে এই পেপারের শেষাংশে (দেখুন সংযুক্তি - ১)।**
[৫] তবে আন্তর্জাতিক বাজারে যখন চালের সঙ্কট দেখা দেয়, এবং চালের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে, তখন এই প্রবণতা দেখা যায় না।

তাই বাজারে যার মজুদ যতো বেশি, বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তার ততো বেশি। এক্ষেত্রে সোলেমান অন্য অনেক চাতাল মালিকের চেয়ে এখন অনেক এগিয়ে আছে। কারণ সোলেমানের বাবা সুন্দর আলী চাতালটি করেছিলেন আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। তখন জমির দাম ছিল কম। তাই তার চাতাল তখন ছোট থাকলেও তিনি আশেপাশে অনেক জমি কিনে রেখেছিলেন।

তাই সোলেমান যখন দায়িত্ব নেয়, তখন সে খুব দ্রুত বেশ কয়েকটি বড় বড় গুদাম তৈরি করে ফেলে। ফলে তার মজুদ করার ক্ষমতা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। তাই সে এলাকায় খুব দ্রুত গতিতে বড় হয়ে যায়। কিন্তু অন্যরা চাতাল ব্যবসায় নেমেছে অনেক পরে। ততদিনে জমির দামও বেড়ে গেছে। তাই সোলেমান এখন অন্যান্য চাতাল মালিকদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এই কারণে অন্যান্য চাতাল মালিকরা একবাক্যে সোলেমানকে নেতা মানে। শুধু তাই নয়, সোলেমান যে মূল্য ঠিক করে, অন্যান্য চাতাল মালিকরাও সেই মূল্য অনুসরণ করে। সোলেমান যখন লাভ বাড়িয়ে দেয়, তখন অন্যান্যরাও লাভ বাড়িয়ে দেয়। বিগত কয়েক বছরে মোবাইল ফোনের কল্যাণে তাদের এই জোটবদ্ধ তৎপরতা আরও বেগবান হয়েছে।

সোলেমানের নের্তৃত্বের আরও কিছু কারণ রয়েছে।

সোলেমান তার বাবা সুন্দর আলীর কাছে থেকে ব্যবসার অনেক খুটিনাটি বিষয় জানতে পেরেছে। সে এখন বোঝে, সে সর্ব্বোচ্চ কতটুকু লাভ রাখতে পারবে। সে যদি বেশি লাভ রাখে, তাহলে বাজারে দাম বেড়ে যাবে। কিন্তু একইসাথে যদি আমদানীর খরচ কমে যায়, তাহলে সরকার আমদানী করে ফেলবে। তবে আমদানী করতেও কিছু সময়ের প্রয়োজন। ফলে সোলেমান তার মূল্য বৃদ্ধি করে তার চাহিদা পরিস্থিতি, আমদানী মূল্য এবং আমদানী করার সময়কাল, ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে।

সুন্দর আলী সোলেমানকে কিছু ব্যক্তির সাথেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সোলেমান যেন এই সকল ব্যক্তিদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাদেরকে সম্মান করে। এদের অনেকেরই অন্যান্য অঞ্চলে আরো বৃহৎ চাতাল রয়েছে। অনেকের কাছে আবার রয়েছে সরকারের ভিতরের তথ্য।

মোবাইল ফোনের বদৌলতে এই সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে তার সম্পর্ক আরো জোরদার হয়েছে[৬]। তাই সোলেমান বাজার সম্পর্কে যা জানে তা এলাকার অন্যান্য চাতাল মালিকরা জানে না।

সকল চাতাল মালিকেরই উদ্দেশ্য বা মিশন স্টেটমেন্ট হল টাকা বানানো। তাই সোলেমান লাভ করতে থাকলে সকলে তাকেই অনুসরণ করে। কেউ যে লাভ কমিয়ে সোলেমানের কিছু ব্যবসা নিয়ে নিবে, সে ধরণের কোন প্রকার তাগিদ তাদের মধ্যে কাজ করে না।

তবে কাশেম মিঞাদের এই সকল জটিল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে যে কোন প্রকার মাথাব্যথা নেই। তার একটি অন্যতম কারণ ধানের দাম প্রতি বছরই কিছু না কিছু বাড়ছে। গত বছর যে ধান তিনি বিক্রি করেছেন ৫০০ টাকা মন দরে, সেই ধান এই বার তিনি বিক্রি করতে পেরেছেন প্রায় ৬০০ টাকা মন দরে। তাই গেল বছরের হিসাবে তিনি দর কিছুটা বেশি পেয়েছেন এবার।

ধানের ফলন যেবার কম হয়, সেবার ধানের দর আরো কিছুটা বেড়ে যায়। আর যেবার বাম্পার ফলন হয়, সেবার দাম পড়ে যায় অনেক। তাই ফসলের দামে এই তারতম্য যে ঘটবেই, সেটা সকল কৃষকই একবাক্যে স্বীকার করেন।

তবে ইদানিং শোনা যাচ্ছে অনেকে মোবাইল ফোন কিনছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আগেভাগেই হাটের দাম জেনে নেয়া যাচ্ছে। তাই যেদিন হাটে দাম কম, কৃষকরা সেইদিন আর ধান নিয়ে হাটে যাচ্ছেন না।

কাশেম মিঞার এই দুর্দিনে মোবাইল ফোন কেনার সামর্থ নেই। তবে কিছুদুরের আকিজ একটি মোবাইল ফোন কিনেছে। সে কাশেম মিঞাকে জানিয়েছে মোবাইল ফোন কেনার ফলে সে আগে ভাগে দাম জেনে যাচ্ছে ঠিকই, তবে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেও দামের তেমন হেরফের হয়নি। তাই তার খুব একটা লাভ হয়নি।

আকিজের এই কথা শুনে মোবাইল ফোন না থাকার সকল আক্ষেপ কেটে গেল কাশেম মিঞার।

---

[৬] মোবাইল ফোনের কারণে চাতাল ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই ধরণের একটি জোট যে গড়ে উঠেছে তা মুলত আমার একটি ধারণা । তবে এই ধারণাকে তত্বে পরিণত করা সহজ নয়। কারণ কোন চাতাল ব্যবসায়ীকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কেউই এটি স্বীকার করবে না। এছাড়াও এই জোটটি গড়ে উঠতে পারে ব্যবসায়ীদের অজান্তেও। কারণ প্রতিটি ব্যবসায়ী পরস্পরের সাথে প্রতিদিন মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রাখছেন এবং বাজারে মুল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তাই বৃহৎ কোন চাতাল মালিক বেশি দামে চাল বিক্রি করছেন জানলে অন্যরাও তা স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণ করবে বলে ধরে নেয়া যায়। তাই এই জোট কোন ফর্মাল জোট নয়। এটি ইনফর্মাল জোটও নয়। বরং একে বলা যেতে পারে একটি ছায়া জোট বা Shadow Syndicate।

কাশেম মিঞা জানেন মাঝে মাঝে অন্য হাটে নিয়ে ধান বিক্রি করলে নাকি মনপ্রতি ১০–২০ টাকা বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু কাশেম মিঞা এই ঝুঁকি কখনোই নেননি। কারণ দুরবর্তী হাটে ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যান ভাড়া আরো বেশি। তাছাড়াও দুরবর্তী হাটে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি যদি দেখেন যে ধানের দর তার হাটের দরের সমানই, তাহলে তাতে তার ক্ষতি আরো বেড়ে যাবে। তাই কাশেম মিঞা ঐ পথ কখনো মাড়াননি।

কৃষকদের এক আড্ডায় কাশেম মিঞা শুনেছেন তাদের এই ধান চাল হয়ে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি হয় শহরে। তাই সুন্দর আলীর চাতালের মতো অন্যান্য চাতালের লাভও বেশি। এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় সোলেমানের চেহারা দেখেই।

কৃষকদের যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরায়, সেখানে সোলেমান নতুন ট্রাক কিনেছে, লুঙ্গি কিনছে, কিনেছে নতুন মাফলার। সম্প্রতি সোলেমান চাতালে উন্নত মেশিন বসিয়েছে যা দিয়ে নাকি মোটা চাল চিকন করা যায়। তাই কাশেম মিঞাদের কাছে মোটা চালের ধান কম দামে কিনে সে তা চিকন করে বেশি দামে বিক্রি করছে। ফলে তার লাভও বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক গুণ। তাই নতুন লুঙ্গি আর মাফলার পরে সোলেমান যখন গ্রামের পথ দিয়ে হেটে যায়, তখন সবাই তাকে সালাম দেয়।

অথচ কাশেম মিঞাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে কৃষিকাজ করে যে আয় হয়, তা দিয়ে ঋণ শোধ করার পর তেমন কিছু থাকে না। কাশেম মিঞার মতো আরো শত শত কৃষকের এই অবস্থা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

এছাড়াও তাদের মতো কৃষকদের জমি কম বলে ফলন হয় কম। তাই নিজের সংসারের বাৎসরিক চাহিদাই পুরোপুরি মেটে না। ফলে তাদের মতো কৃষকরা যে ধান বিক্রি করেছে আজকে, সেই ধান থেকে করা চালই বছর শেষে তাদেরকে বাজার থেকে কিনতে হয় প্রায় দ্বিগুণ দামে। ফলে সংসারের খরচ বাড়ে, বাড়ে দারিদ্র্য।

এই দারিদ্র্য আরো বেড়ে যায় বন্যা বা খরার কারণে ফসলহানি হলে। এই ধরণের দুর্যোগের সময় কৃষকদের জীবনধারণ করাই কষ্টকর হয়ে যায়। তখন তাদেরকে চলতে হয় অবস্থান্ন প্রতিবেশী কিংবা মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ধার নিয়ে। কিন্তু পরবর্তী ফসল ওঠার সময় ফসলের দামের তেমন কোন আহামরী

দাম থাকে না। তখন শোনা যায় সরকার নাকি খাদ্য সঙ্কট কাটাতে বিদেশ থেকে কম দামে চাল আমদানী করে ফেলেছে। তাই বাজারে ধানের দাম কম।

তাই কাশেম মিঞাদের আর্থিক অবস্থা একবছর কিছুটা ভাল থাকলেও পরবর্তী বছর হয়তো আরো খারাপ হয়ে যায়। এ যেন বানরের তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার প্রচেষ্টা।

তাই একদিন এক কৃষক প্রস্তাব দিয়েছিল তারা সবাই যদি এক হয়ে কিছু ধান চাল করে শহরে দ্বিগুণ দামে বিক্রি করে আসতে পারতো, তাহলে তারা আরো বেশি দাম পেত। কিন্তু এই প্রস্তাব সকলের কাছেই অবাস্তব মনে হয়েছে।

কারণ তারা কেউই জানেন না এই চাল কোথায় বিক্রি করতে হবে, কিভাবে বিক্রি করতে হবে, কিভাবে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, শহরে যেতে কেমন সময় লাগবে, সেখানে তারা থাকবে কোথায়, আড়তদার তাদেরকে নগদ টাকা দেবে কিনা, আবার সেই টাকা নিয়ে তারা নিরাপদে ফিরতে পারবে কিনা, এই সব বিষয়ই তখন তাদের মাথায় এসেছিল।

এক কৃষক বলেছিল পাঁচ মাস খেয়ে না খেয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়ে তা যদি আবার বিক্রি করার জন্য শহরে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে আর কৃষি কাজ করে লাভ কি। তাই সব বিষয় এক করে তারা প্রস্তাবটি একবাক্যে খারিজ করে দিলেন।

সোলেমানকে বললে সে যে কোন প্রকার সাহায্য করবে না সেটাতো সকলেই জানে।

পাশের গ্রামের মোখলেসকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা যায়। সে নাকি ইদানিং কিছু শহুরে আড়তদারদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছে। এতে সাহায্য করেছে তারই এক বন্ধু যার একটি দোকান আছে শহরে। সেই মোখলেসকে দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে আড়তদারদের কাছে চাল বিক্রি করতে হয়।

কিন্তু মোখলেসের কাছে কাশেম মিঞারা কিভাবে সাহায্য চাইবে?

মোখলেসের চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়েছিল কাশেম মিঞার মামাতো বোন একই গ্রামের কুলসুমের। বিয়েতে যৌতুক দিতে পারেনি বলে মোখলেসের

চাচাতো ভাই কুলসুমকে মেরে বাপের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছে। এই কারণে কাশেম মিঞাদের সাথে মোখলেসদের পরিবারের সম্পর্ক ভাল নয়।

শুধু তাই নয়, একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কাশেম মিঞাদের গ্রামের সাথে মোখলেসদের গ্রামের একটি বিরাট মারামারি হয়েছিল মাত্র কিছুদিন আগে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের মানুষদের মধ্যে এখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তাই মোখলেসদের গ্রামের কেউ যে কাশেম মিঞাদের সাহায্যে আসবে না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই কাশেম মিঞাদের একমাত্র ভরসা সুন্দর আলীর চাতালের ফড়িয়ারা। এই ফড়িয়াদের কবল থেকে কাশেম মিঞারা বের হতে পারছেন না, বের হওয়ার কোন প্রকার তাগিদও নেই তাদের মধ্যে। কারণ এটাই এখানকার নিয়ম। এই নিয়মই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

৪. কাশেম মিঞার জীবন শিক্ষা

কাশেম মিঞার হঠাৎ একদিন কি হল, তিনি সকাল বেলা উঠে খাতা কলম নিয়ে বসে গেলেন নিজের জীবনের পোস্টমোর্টেম করতে। তার এই বর্তমান দুরবস্থার কারণ কি, এ নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন এবং খাতায় একটি করে নোট লিখতে লাগলেন।

তার এই নোট লেখা খাতাটি আমরা পেয়েছি। আমরা এখন দেখব, তিনি তার খাতায় কি কি লিখেছেন। নোটগুলো পড়ে আমরা যা যা বুঝতে পারলাম তা হলঃ

১. তিনি তার দুরবস্থার জন্য প্রথম দায়ী করলেন তার ভাই সিদ্দিক মিঞাকে। সিদ্দিক মিঞার সাথে তার সম্পর্ক ভাল নয়। তাদের মধ্যে যদি সুসম্পর্ক থাকতো, তাহলে তাদের জমিজমার বিরোধ মিটে যেত। ফলে তারা দুই ভাই এক থাকতে পারতেন। সিদ্দিক মিঞার সাথে ভাল সম্পর্কের কারণে রেহানা যেমন সময় সময় লাভবান হচ্ছে, তেমনি লাভবান হতে পারতো কাশেম মিঞাও। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সিদ্দিক মিঞার লোভ বেশি। সে সবকিছু খেয়ে ফেলতে চায়।

২. সিদ্দিক মিঞার সাথে খারাপ সম্পর্কের কারণে কাশেম মিঞাকে বেশ চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়। তাই তিনি তার দৈনন্দিন কাজকর্মে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

৩. কাশেম মিঞা তার দুরবস্থার জন্য তার স্ত্রী হালিমাকেও দায়ী করলেন। তার বিয়েতে যদি তার শ্বশুর জমিজমা লিখে দিতেন, তাহলে তার আজকের এই দুরবস্থা হতো না।

৪. কাশেম মিঞা দায়ী করলেন তার বড় পরিবারকেও। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়াতে তার ব্যয় বাড়ছে। ফলে শস্য বেশি দামে বিক্রি করেও তিনি তার আয় বাড়াতে পারছেন না। তাই আয় বাড়াতে হলে তার মেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।

৫. কাশেম মিঞার মতে সার এবং কীটনাশকের বেড়ে যাওয়া দাম তার দুরবস্থার আরও একটি কারণ। একই জমিতে চাষ করতে তার এখন বেশি খরচ হচ্ছে। ফলে আয় যাচ্ছে কমে। প্রয়োজনের তুলনায় সার এবং কীটনাশক না পাওয়ার কারণে ফলনও কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি সারের মধ্যে ভেজালও পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্যাটি হয় সারের দাম বেড়ে গেলে। তাই একই পরিমাণ সারে ফলন হয় তুলনামূলক কম, এবং এতে জমির উর্বরতাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৬. কাশেম মিঞার মতে জমিতে যদি আরও অধিক ফসল ফলানো যেত তাহলে তার আয় আরও বাড়তো। কিন্তু এর প্রস্তুতির জন্য চাই আরো টাকা। এতো টাকা তিনি পাবেন কোথায়?

৭. ফড়িয়াদের উপরে কাশেম মিঞার তেমন কোন অভিযোগ নেই কারণ প্রতি বছরই তিনি আগের বছরের তুলনায় বেশি দাম পাচ্ছেন। তাই ফসলের দাম না পাওয়া বিষয়ে তিনি একটি নোট লিখলেন বটে, তবে পরে তা কেটে দিলেন।

৮. তবে তিনি জানেন তার ফসলই শহরে বিক্রি হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ দামে। কিন্তু যে সকল অসুবিধার কথা তারা বলাবলি করেছেন, সেই সকল অসুবিধা দুর না হলে এই দামের সুফল যে তারা পাবেন না, এটা কাশেম মিঞাও বোঝেন।

৯. কাশেম মিঞাদের সাথে পাশের গ্রামের ভাল সম্পর্ক থাকলে তারা মোখলেসকে কাজে লাগিয়ে জেনে নিতে পারতেন শহরে চাল বিক্রি করার কলা কৌশল। ফলে তারা লাভবান হতেন বেশি মূল্য থেকে।

১০. কাশেম মিঞার মতে, মোবাইল ফোন কিনে খুব একটা লাভ নেই। তাই মোবাইল ফোন কেনার চিন্তা বাদ।

১১. আক্কাস আজকে বেঁচে থাকলে সে হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে আজ বেঁচে নেই।

১২. কাশেম মিঞার মতে জমিজমা বিক্রি করে বিদেশ চলে যেতে পারলে মনে হয় সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কাশেম মিঞা এই বারোটি পয়েন্ট লিখে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তার মতে এই বারোটি সমস্যার সমাধান তিনি যদি করতে পারেন, তাহলেই কেল্লাফতে।

কিন্তু কাশেম মিঞার এই চিন্তাধারা কতোটুকু সঠিক?

৫. কাশেম মিঞার জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা

এখন দেখা যাক, কাশেম মিঞার জীবন থেকে আমরা কি কি শিখতে পারলাম। আমরা যা বুঝতে পারলাম তা হলঃ

১. সিদ্দিক মিঞার সাথে ঝগড়া ঝাটিতে কাশেম মিঞার অনেক মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। সিদ্দিক মিঞার এই অতিরিক্ত লোভের কারণে তারা কোনকিছু এক সাথেও করতে পারছেন না। ফলে তার উৎপাদনও ব্যহত হচ্ছে।

২. তিন ভাইয়ের পরিবারের মধ্যেই সামাজিক সুসম্পর্ক নেই। এই ধরণের সুসম্পর্ক না থাকলে এক হওয়া সম্ভব নয়। তিনটি পরিবারের মধ্যেই যেখানে সামাজিক সুসম্পর্ক আপনা আপনি গড়ে উঠছে না, সেখানে পুরো গ্রামের মানুষদের মধ্যে একতা আনা অনেক কঠিন।

৩. বড় পরিবারের কারণে কাশেম মিঞার খরচ বেশি। এই খরচ তিনি তার আয় দিয়ে কুলাতে পারছেন না।

৪. কাশেম মিঞা মনে করেন তিনি ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন। কিন্তু তার এই দাবী কতটুকু সঠিক?

৫. বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের কল্যাণে জাতীয় উৎপাদন যে আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মোবাইল ফোন যে একটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে, তা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সহজে তথ্যপ্রাপ্তি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যাও সৃষ্টি করছে যা কাশেম মিঞার গল্পে আমরা দেখেছি। তবে তার মানে এই নয় আমাদেরকে মোবাইল ফোনের বিরুদ্ধে যেতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শুধু তথ্য পেয়ে লাভ নেই। এই তথ্যকে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. গ্রামীণ সামাজিক সম্পর্ক এবং মানুষের স্বভাব উৎপাদন এবং দারিদ্র্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

৭. কাশেম মিঞার পরিবার যৌতুকের কুফল নিজের চোখে দেখলেও তিনি নিজে আবার ছেলের বিয়ের বেলাতে যৌতুক নিতে চাচ্ছেন।

৮. ফসলের দাম কাশেম মিঞারা নিজেরা ঠিক করেন না। করে ফড়িয়ারা। এর কারণ পরিবহন খরচ এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থার কারণে কাশেম মিঞাদের অবস্থান থাকে দুর্বল। ফড়িয়ারা এই দুর্বল অবস্থাকে কাজে লাগায় ষোলআনা।

৯. ফসলের দাম বিগত দিনে কিছুটা বাড়লেও এতে সকল খরচ এবং ঋণ পরিশোধ করেও কাশেম মিঞাদের হাতে তেমন কিছু থাকছে না। তাই তাদের অবস্থারও কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

১০. কাশেম মিঞারা সুন্দর আলীর চাতালের ফড়িয়াদের কাছে জিম্মি। মোবাইল ফোন কিনেও তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, কারণ মোবাইল ফোন শুধু কৃষকরাই কেনেনি, কিনেছে ফড়িয়ারাও। তাই তারা আগেভাগে নিজেরা দাম ঠিক করে আসে। কিন্তু সেই অনুপাতে কৃষকরা সংগঠিত নয় বলে মোবাইল ফোনের এই সুবিধা কৃষকরা কাজে লাগাতে পারছে না।

১১. মোবাইল ফোনের কারণে সোলেমান অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথে আরো ভালভাবে যোগাযোগ রাখতে পারছে। ফলে তাদের সম্পর্ক হয়েছে আরো দৃঢ়। ফলে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে তার ধারণা আগের চেয়ে এখন আরো অনেক ভালো হয়েছে।

১২. উৎপাদন কম হলে ফসলের দাম বাড়ে, কিন্তু উৎপাদন বেশি হলে দাম পড়ে যায় অনেক[৭]। ফলে অনেক সময় কৃষকের উৎপাদন খরচই উঠে আসে না।

[৭] বাম্পার ফলনের কারণে শস্যের দাম কমার এই ব্যাপারটি অন্যান্য বারের তুলনায় বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে খুব একটা দেখা যায়নি। অন্তত, মিডিয়াতে এই ধরণের কোন রিপোর্ট আসেনি। হতে পারে, সাম্প্রতিকালের আন্তর্জাতিক বাজারে শস্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে এই প্রবণতাটা কিছুটা হলেও কমেছে। সেইসাথে তৎকালীন সরকারের কিছু পদক্ষেপও এর অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে। এই সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা পড়ুন রিপোর্টটির শেষাংসে (সংযুক্তি – ২)।

১৩. সরকার কৃষকদের ভর্তুকি দিলেও সেই ভর্তুকি অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকদের হাতে পৌঁছে না[৮]। সেই সাথে এই ভর্তুকি তারা নিজেরা চোখে দেখে না বলে অনেকে এই ধরণের কথা বার্তা বিশ্বাসও করে না। বরং এই ধরণের কথাবার্তা জনপ্রতিনিধিদের উপর তাদের আস্থা কমিয়ে দেয়।

১৪. জনপ্রতিনিধি হলেই যে গ্রামের মানুষের কথা একজন ভালভাবে বুঝতে পারবে, এই ধারণা ঠিক নয়। গ্রামে অনেক রাজনীতিবিদ আছেন যাদের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাল সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তারা বিভিন্ন কারণে উপরে উঠতে পারেন না।

১৫. কাশেম মিঞা বিদেশ যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন। তিনি শুনেছেন তিন লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ গেলে নাকি এক বছরে তা উঠে আসে। তিনি বিভিন্ন সাফল্যের কথা শুনেছেন কিন্তু চোখে দেখেননি। এ ছাড়াও তিনি শুধু সাফল্যের কথাই শুনেছেন। কোন ব্যর্থতার কথা তার কানে আসেনি। এই কারণে অনেক কৃষকই জমিজমা বিক্রি করে পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। কারণ তারা মনে করছেন কৃষি কাজ করে কোন লাভ নেই। ফলে কৃষকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

[৮] বিগত তত্বাবধায়ক সরকার আমলে সর্বপ্রথম কৃষকদের কাছে সরাসরি ভর্তুকি দেয়ার কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. দারিদ্র্যের কারণ এবং “দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন তত্ত্ব”

দারিদ্র্য নিয়ে যদি পাঠকরা গবেষণা শুরু করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, কাশেম মিঞার অনেক দাবীই সঠিক। আবার অনেক দাবীই সঠিক নয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে সকল গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে এর অনেকগুলো কারণই দেখানো হয়েছে। আবার এমন আরো অনেক কারণ দেখানো হয়েছে যা এই গল্পে দেখানো হয়নি। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এই সবকয়টি কারণকেই আঘাত করতে হবে। তাহলেই দারিদ্র্য কমবে। এই কারণে বলা হয় All Routes Matter বা সকল পথই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে আমাদের মতে দারিদ্র্যের অনেকগুলি কারণ থাকলেও এর একটি আদি কারণ থাকতে হবে। এই আদি কারণই মুল কারণ। অন্যান্য কারণগুলি এই আদি কারণ হতে সৃষ্ট বা এর সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত।

যেমন আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, দারিদ্র্যের কারণ কি, তাহলে আমি উত্তর দেব, কাশেম মিঞাদের মতো দরিদ্র কৃষকদের হাতে টাকা নেই, এই কারণেই তারা দরিদ্র।

তাদের হাতে টাকা নেই কেন?

কারণ তারা যে পেশার সাথে নিয়োজিত সেই পেশা থেকে প্রাপ্ত আয় তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। একই জমিজমা থেকে তাদের আয় যদি বাড়ানো যেত তাহলে বড় পরিবার, সামাজিক খারাপ সম্পর্ক এবং আরো অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েও তাদের আর্থিক অবস্থা আরো অনেক ভাল করা যেত।

কিন্তু কাশেম মিঞারা তো প্রতি বছরই ধানের ভাল দাম পাচ্ছে। তাহলে তাদের সমস্যাটা কোথায়?

না। তারা ভাল দাম পেলেও তা ন্যায্য দাম নয়। তারা যে ন্যায্য দাম পাচ্ছে, এটা আসলে একটি ভুল ধারণা। মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগেও তারা তাদের পণ্যের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। অথচ মুক্ত বাজারের কারণে সঠিক মূল্য তাদেরকে দিতে হচ্ছে কৃষি উপকরণের পিছনে। মুক্তবাজারের কারণে তাদের জীবনযাএার ব্যয়ও আগের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে তাদের শস্যের বিক্রয়মূল্য বাড়েনি।

এখানে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, ন্যায্যমূল্য বলতে আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি।

কোনটি ন্যায্যমূল্য এবং কোনটি নয়, ব্যাপারটা অনেকটা আপেক্ষিক। একজনের কাছে ৪০% লাভ রেখে বিক্রয়মূল্য ধার্য করা ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারে, আবার একই বিক্রয়মূল্যকে অপর একজন ন্যায্যমূল্য না-ও বলতে পারে। অনেকে দাবী করতে পারেন, প্রতি বছর যেহেতু সরকার ধানের একটি নির্দিষ্ট দাম ঠিক করে দিচ্ছে, সেহেতু কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না, এই অভিযোগটি অমূলক।

কিন্তু আমাদের এতে ভিন্নমত রয়েছে। বাংলাদেশের আপমার কৃষক সমাজ যে তাদের কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না, তার স্বপক্ষে আমাদের যে সকল যুক্তি রয়েছে তা আমি একে একে তুলে ধরছিঃ

১. রিস্ক - রিটার্ন

একটি পণ্য বিক্রি করে যে লাভ হয় তা যদি পণ্যটি উৎপাদন করার ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে সেই বিক্রয়মূল্যটিকে ন্যায্যমূল্য বলা যাবে না। ফিন্যান্সের একটি Golden Rule হল একটি ব্যবসার ঝুঁকি বা Risk যতো বেশি, তার লাভ বা Return ততো বেশি হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই ব্যবসা করা উচিত নয়।

আমরা যদি এখন বাংলাদেশের একজন কৃষকের ব্যবসায়িক ঝুঁকি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষিকাজ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। এর চেয়ে বেশি ঝুকি একমাএ অবৈধ পেশাতেই রয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে কৃষি পেশাতে লাভ অন্যান্য যে কোন ব্যবসার চেয়ে অনেক কম।

বাংলাদেশের একজন কৃষক যখন তার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি জানেন না তার এই বিনিয়োগটি আদৌ উঠে আসবে কিনা। তিনি আজ যে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন, তা বন্যা, খরা, বা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে একেবারেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অথবা তিনি যখন ফসল উঠাবেন, তখন বাজারে এমন দাম

থাকবে যাতে হয়তো তার উৎপাদন খরচই উঠে আসবে না, অথবা যদি বাজারের পরিস্থিতি ভাল থাকে তাহলে তিনি বাজার মূল্যে তার শস্য বিক্রি করে হয়তো সর্ব্বোচ্চ ৪০% লাভ করতে পারবেন। এর বেশি নয়।

কিন্তু এতো ঝুঁকি নিয়েও আমাদের কৃষকদের গড় লাভ হয় শতকরা কতো ভাগ? একটি বছর একজন কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪০% লাভ পেলেও এই লাভ কি তিনি বছর বছর ধরে রাখতে পারেন? কৃষিপেশা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হলেও কৃষিপেশা কি বাংলাদেশের সবচেয়ে লাভজনক পেশা?

বাংলাদেশের কৃষকদের এই ধরণের ঝুঁকি আধুনিক বিশ্বের Venture Capitalist দের ঝুঁকির সাথে তুলনীয়। Venture Capitalist রা সেই সকল ব্যবসাতেই বিনিয়োগ করেন যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু ব্যবসাটি সফল হলে এতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। Venture Capitalist রা খুব ভাল করেই জানেন এই ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে তাদের পুরো টাকাটাই তারা হয়তো হারাতে পারেন, আবার তাদের ব্যবসা যদি বাজারে সাড়া ফেলতে পারে, তাহলে তাদের এই বিনিয়োগ বহুগুণে ফেরত আসতে পারে।

এখানে সবচেয়ে ভাল হতো যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি কাজের রিস্ক এবং রিটার্নের সাথে অন্যান্য ব্যবসার রিস্ক এবং রিটার্নের একটি তুলনা দেয়া যেত। কিন্তু তথ্যের অভাবের কারণে তা আপাতত দেয়া যাচ্ছে না। তাই বিকল্প হিসাবে আমরা কয়েকটি Proxy Indicator এর সাহায্য নিচ্ছি।

বাংলাদেশের কৃষিখাতের ঝুঁকি অন্যান্য যে কোন ব্যবসার চেয়ে যে অনেক বেশি তা বোঝা যায় কৃষিখাতে ঋণ প্রদানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। যেমন, এতোদিন বাংলাদেশের ব্যক্তিখাতের ব্যাংকগুলি কৃষি ঋণ দিতে আগ্রহী ছিল না। ২০০৮ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের জন্য কৃষি ঋণ বাধ্যতামূলক করেছে। এই নির্দেশনা না দিলে কোন ব্যক্তিখাতের ব্যাংকই হয়তো এখনো কৃষিঋণ দিত না।

এখানে ব্যাংকের ঋণ প্রদান পরিস্থিতি দেখে অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় কৃষি কাজের রিস্ক এবং রিটার্নের একটি পরোক্ষ চিএ পাওয়া যায়। কারণ ব্যাংকারা যখন একটি ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনা করেন, তখন তারা এই রিস্ক এবং রিটার্নের উপর ভিত্তি করেই তাদের ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তটি নেন।

যেহেতু এতোদিন ব্যক্তিখাতের ব্যাংকাররা কৃষিখাতে ঋণ দিতে অপারগ ছিলেন, তাতে ধরে নেয়া যায় যে ব্যাংকারদের মতে বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় কৃষি কাজে ঝুঁকির তুলনায় রিটার্ন অনেক কম। ফলে ব্যাংকের ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। তা যদি না হতো, তাহলে ব্যক্তিখাতের ব্যাংকাররা নিজেদের ব্যবসার তাগিদেই কৃষিখাতে ঋণ দিতেন। এর জন্য সরকারকে কোন প্রকার জোর খাটাতে হতো না।

অনেকে বলতে পারেন, দেশের যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে তারা তো আরো দরিদ্র মানুষদের ঋণ দিচ্ছে এবং এর বদলে তারা সুদ নিচ্ছে ১৬–২০% হারে। তাহলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকেই যদি এই হারে ঋণ দেয়া যায়, তাহলে কৃষকদের ঋণে তো সুদের হার আরো কম হওয়া উচিৎ[৯]। এর মানে দাঁড়ালো, কৃষি খাতে ঝুঁকি অন্তত সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চেয়ে কম। সুতরাং তারা যে অতিরিক্ত ঝুঁকির মাঝে কৃষিকাজ চালাচ্ছে, সেই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

হ্যা। ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষকদের চেয়েও আরো বেশি দরিদ্রদের ঋণ দিচ্ছে তা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কৃষকদের চেয়ে বেশি। বরং এখানেও দেখা গেছে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষকদেরকে ঋণ দিতে চায় না।

কারণ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি এমন ব্যবসাতে ঋণ দিতে আগ্রহী যেখানে প্রতি সপ্তাহে কিস্তি দেয়ার মতো আয় থাকবে। কিন্তু কৃষকরা হাতে টাকা পায় প্রায় ৪–৫ মাস অন্তর। তাই তাদের টাকা ফেরত দেয়ার সম্ভাবনাও অনেক অনেক কম। এই বিবেচনায়, ব্যক্তিখাতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিও কৃষি খাতে ঋণ দিতে অনীহা দেখায়।

কৃষিখাতের অতিরিক্ত ঝুঁকিই যে ব্যাংকারদেরকে কৃষি ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহিত করছে তা বলাই বাহুল্য। ব্যাংকাররা মনে করছেন তাদের যে টাকা রয়েছে তা যদি তারা অন্যান্য ব্যবসাতে ঋণ দেন তাহলে তা সুদে আসলে ফেরত আসার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কৃষিখাতে এই ঋণ গেলে তা ফেরত আসার সম্ভাবনা কম। এই কারণেই তারা অতীতে এই খাতে কোন ঋণ দেননি।

[৯] সুদের হার নির্ধারণে একটি ব্যাংক ঝুকিমুক্ত সুদের হারের **(Risk Free Interest Rate)** সাথে মুদ্রাস্ফীতির মার্জিন **(Inflation Premium)** এবং ব্যবসার ঝুঁকির জন্য অতিরিক্ত মার্জিন **(Risk Premium)** যোগ করে মোট সুদের হার ঠিক করে। তাই কোন ব্যবসার ঝুঁকি যদি কম থাকে, তাহলে **Risk Premium** কমে যায়, কিন্তু অন্যান্য উপাদান ঠিকই থাকে। ফলে মোট সুদের হার কম ঝুঁকিপুর্ণ ব্যবসাতে কম ধার্য করা হয়।

২. অবমুল্যায়িত খরচ

কৃষিখাতের অতিরিক্ত ঝুঁকির পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদন খরচ নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। কৃষকের উৎপাদন খরচ বাস্তবে যা বলা হয়, প্রকৃত খরচ তার চেয়েও অনেক বেশি। যেমন, **উন্নয়ন অন্বেষণ – The Innovators** এর একটি গবেষণাতে বলা হয়েছে কৃষক কখনো তার নিজের শ্রমের মজুরী তার উৎপাদন খরচে যোগ করে না। ফলে উৎপাদন খরচ অবমুল্যায়িত রয়ে যায়।

এছাড়াও কৃষির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, কিন্তু কৃষকের মোট আয়ের উপর প্রভাব ফেলে এমন অনেক খরচ আছে যা আমরা বিবেচনাতে আনিনা। যেমন একজন কৃষক যদি তার সন্তানকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে, তাহলেও তার একটি বিরাট খরচ রয়েছে যা হিসাবে আনা হয় না।

একটি বন্যাতে যদি কৃষকের পুরো ফসলই নষ্ট হয়ে যায় এবং সে মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে জীবন ধারণ করে, তাহলে তার খরচ সে তার পরবর্তী ফসলের উৎপাদন খরচের সাথে যোগ করে না। সেই সাথে রয়েছে সার আনার ঝক্কি-ঝামেলার কারণে অতিরিক্ত খরচ যা কৃষকের মোট খরচে প্রতিফলিত হয় না। তাই কৃষকের লাভ হিসাব করতে গিয়ে এই সকল খরচ হিসাবে আনা হয় না বলে কৃষকের প্রকৃত লাভ অনেক কম।

একজন কৃষকের প্রকৃত লাভ কতোটা হয়, সে সম্পর্কেও একটি গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যে পরিবারটি কৃষির সাথে যুক্ত, সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্যই কোন না কোনভাবে এই পেশায় সাহায্য করেন। তাই একটি কৃষক পরিবারকে ধরা যেতে পারে এক একটি Very Small Enterprise (VSE) হিসাবে। এই VSE কৃষক বাবাকে ধরা যেতে পারে তার Enterprise এর চেয়ারম্যান, তার স্ত্রী ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এবং তার সন্তানেরা Executives।

এবং ধরা যাক, এই পরিবারটির কৃষি আয় ছাড়া আর কোন আয় নেই, কৃষক হালের বলদ দিয়ে চাষ করছেন, তিনি বছরে দুটি ফসল ঘরে তুলতে পারেন এবং তার কোন করযোগ্য আয় নেই। এখন এই Enterprise টির একটি বছরের লাভ-ক্ষতির বিবরণীর (Profit and Loss Account) একটি নমুনা দেখা যাকঃ

Kashem Miah Enterprise
Profit and Loss Account
For the Year Ended December 31, 2009

(1) Sales Revenue
(2) Cost of Goods Sold

(3) Gross Profit (1 – 2)

(4) Sales Expenses
(5) Administrative Expenses
(6) Interest Expenses

(7) Pre Tax Profit {3 - (4 + 5 + 6)}

(8) Taxes

(9) Net Profit After Tax (7 – 8)

এখন আমরা যখন সনাতন পদ্ধতিতে কৃষকের নীট আয় (পয়েন্ট ৯) হিসাব করি, তখন শুধুমাএ পয়েন্ট ১, ২, ৩, ৪ এবং ৬ হিসাব করি। কিন্তু বাদ দিয়ে দেই একটি গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্ট ৫ কে। এই পয়েন্টে অন্তর্ভুক্ত হবে একটি কৃষক পরিবারের সাংসারিক খরচ যেমন সন্তানের পড়ালেখার খরচ, অন্যান্য যাতায়াত খরচ, চিকিৎসা ব্যয়, ইত্যাদি। তাই কৃষকের প্রকৃত লাভ সম্পর্কে আমাদের মনে একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

আবার এই কৃষক পরিবারটির আয়ের সুযোগ হয় বছরে দুই বার। তাই প্রথম বারে তার যদি ফসল নষ্ট হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার সেই মৌসুমে নীট আয় হবে ঋণাত্বক। ধরা যাক এই পরিমাণটি –৩০,০০০ টাকা। সেই ঋণাত্বক নীট আয়কে যোগ করতে হবে পরবর্তী মৌসুমের নীট আয়ের সাথে।

তাই যদি আমরা ধরি দ্বিতীয় মৌসুমে তিনি মোটামুটি ফলন পেয়েছেন এবং ধণাত্মক নীট আয় করতে সমর্থ হয়েছেন (ধরা যাক এই আয় +৪০০০০ টাকা), এরপরও বাস্তবে আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের হিসাবে তার বছর শেষে নীট আয়

হয়েছে অনেক কম, মাএ +১০০০০ টাকা। কিন্তু আমরা মনে করছি, বছর শেষে এই আয়ের পরিমাণটি আরো অনেক বেশি।

তাই বর্তমানে সরকার যখন ধানের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে তখন শুধু উৎপাদন খরচই হিসাব করে যা আবার উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে অবমূল্যায়িত। অথচ সরকার যখন একজন সরকারি অফিসারের বেতন ভাতা নির্ধারণ করে, তখন কিন্তু শুধু সরকারি অফিসারের সেবার মূল্যই ধার্য করা হয় না, এর সাথে যোগ করা হয় বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ব্যয়, বাচ্চাদের শিক্ষা খরচ, ইত্যাদি। তাই সরকারি অফিসারের বেলাতে তাদের সেবার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে সেবার মূল্য ছাড়াও অন্যান্য খরচও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কৃষকের বেলাতে শুধুমাএ উৎপাদন খরচই হিসাবে আনা হচ্ছে, কিন্তু বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ।

৩. মুক্তবাজারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

কৃষক যে তার শস্যের ন্যায্যমূল্য পায় না, এর পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি একটি প্রশ্নের মাধ্যমেই উত্থাপন করা যাক।

একজন কৃষক যে পণ্য উৎপাদন করে তা একজন ভোক্তার জীবন ধারণের জন্য কতোটা প্রয়োজনীয় এবং সেই অনুপাতে একজন ভোক্তা কতো টাকা এর পিছনে ব্যয় করছে?

আমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব, কৃষক আমাদের জীবনধারণের জন্য আসলে সবচেয়ে মৌলিক পণ্যটিই উৎপাদন করছে। অথচ আমরা ভোক্তারা এর জন্য মূল্য বেশি দিতে রাজি নই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল একজন ভোক্তার আয় যতো বাড়তে থাকে, খাদ্যে তার আনুপাতিক খরচ ততো কমতে থাকে। অর্থাৎ, একজন দরিদ্র ব্যক্তির খাদ্যে খরচ যদি প্রতি মাসে ৭০% হয়, তাহলে আয় বাড়লে এই শতকরা হার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তখন ব্যক্তিটি তার আয়ের একটি বিরাট অংশ খরচ করে অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পুরণে।

অথচ খাদ্যের মূল্য বাড়লেই এটি হয়ে যায় একটি রাজনৈতিক ইস্যু। ফলে সরকারকে এমন পদক্ষেপ নিতে হয় যাতে বাজারে শস্যের দাম কম থাকে।

খাদ্যের পাশাপাশি মানুষের আরো যে মৌলিক চাহিদা রয়েছে সেগুলি হল বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, এবং শিক্ষা। আমাদের দেশে চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা মূলত সরকারই করে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিখাতে যে চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা খুবই ব্যয়বহুল।

এই সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে যে হারে সেবার মূল্য ধার্য করা হয় তা সাধারণ মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তারপরও ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তারা এই হারে সেবার মূল্য ধার্য করছেন কারণ, প্রথমত, এই সেবার চাহিদা রয়েছে, দ্বিতীয়ত, এই দুটি খাতে সেবার মূল্য নির্ধারণে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করছে না, এবং তৃতীয়ত, এই সেবাগুলোর আন্তঃদেশীয় স্থানান্তর খুব একটা সহজ নয়। এর জন্য রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা।

একই পরিস্থিতি বস্ত্র এবং বাসস্থানের ক্ষেত্রেও। এই দুটি মৌলিক চাহিদাও পূরণ হয় মূলত ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে। এই দুটি সেবা দিতে গিয়ে ব্যক্তিখাতের যে লাভ হয় তা ঝুঁকির তুলনায় অনেক বেশি বলেই আমাদের দেশে একের পর এক টেক্সটাইল গড়ে উঠছে, গড়ে উঠছে গার্মেন্টস। সেই সাথে গড়ে উঠছে একের পর এক এপার্টমেন্ট পলী।

এখানে উল্লেখ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান এবং বস্ত্রখাতের পণ্য এবং সেবাগুলোর আন্তঃদেশীয় স্থানান্তরে যেমন নানামুখী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তেমনি এই পণ্য বা সেবাগুলো যারা দেন, প্রতিটি দেশেই তাদের স্ব স্ব শক্তিশালী লবি গ্রুপ রয়েছে যারা এই সেবাগুলির মুক্ত আমদানী রপ্তানীতে বাধার সৃষ্টি করেন।

কিন্তু কৃষিখাতের পরিস্থিতি এক রকম নয়। অন্যান্য শিল্পের মত আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা খাদ্যের সংস্থানও করছে ব্যক্তিখাত। এই খাতকে উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকার হয়তো বিভিন্নভাবে প্রনোদনা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুক্তবাজারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে এই খাতের উদ্যোক্তাদের বাঁচাতে সকলেই যেন উদাসীন।

এই খাতের পণ্যগুলির ধরণ এমনই যা খুব সহজেই এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত হতে পারে। এতে যেমন আমদানী কর আরোপ করে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় না, তেমনি অধিকাংশ দরিদ্র অথচ কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে কৃষকরা সংঘটিত না থাকাতে তাদের দাবীগুলো তারা যথাযথভাবে সবার সামনে তুলে ধরতে পারে না।

যেমন, কোন এক মৌসুমে যদি বন্যা বা খরার কারণে ফসলহানি হয় এবং কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষক চাইবে পরবর্তী মৌসুমের ফলন দিয়ে তার এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে।

কিন্তু কৃষক তা পারে না কারণ খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে এই অযুহাতে সরকার সহ ব্যক্তিখাত তখন অন্যান্য দেশ থেকে কম দামে এবং শূণ্য শুল্কতে খাদ্য আমদানী করে। এই ধরণের আমদানীকৃত শস্যের অবাধ প্রবাহের কারণে বাজারে শস্যের দাম পরবর্তী মৌসুমে প্রত্যাশা অনুযায়ী ওঠে না। ফলে কৃষক তার ক্ষতি পোষাতে পারে না।

আবার অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা এবং যোগানের নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকার কারণে আমদানী হয় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। ফলে বাজারে শস্যের মূল্যকেও তা প্রভাবিত করে। এখানে উলেখ্য, বিশ্বের অন্যতম যে সকল চাল উৎপাদনকারী দেশ রয়েছে, তার প্রায় সব দেশেই চালের বাজারে সরকার হস্তক্ষেপ করে এবং এমন নীতির অনুসরণ করে যাতে বাজারে সবসময় চালের দাম কম থাকে।

এখন প্রশ্ন হল, সরকার যদি একজন ডাক্তারের সেবার মূল্য ধার্য করাতে হস্তক্ষেপ না করে, একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুল ছাএ-ছাএীদের কাছ থেকে কত বেতন নেবে, তাতে যদি হস্তক্ষেপ না করে, এবং সেইসাথে এই সকল সেবা বা পণ্যের অবাধ আমদানী রপ্তানীতে বিভিন্নভাবে বাধা বজায় রাখে, তাহলে শুধুমাএ কৃষকের বেলাতে সরকারের অবস্থান উল্টো কেন?

এখানে স্বাভাবিকভাবেই উওর আসবে, কৃষক যদি এখন উচ্চমূল্যে তার শস্য বিক্রি করতে থাকে, এবং সরকার যদি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে শস্যের অবাধ আমদানীতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাহলে খাদ্য নিরাপওা ব্যাহত হবে। ফলে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। অতীতে দেখা গেছে শস্যের হঠাৎ উচ্চমূল্যের কারণেই দুর্ভিক্ষ হয়েছে।

এই ধরণের একটি ধারণা কতোটা সঠিক তা নিয়ে একটি ভাল বিতর্ক হতে পারে। কারণ আমাদের মতে, দুর্ভিক্ষের মুল কারণ শস্যের উচ্চমূল্য নয়, বরং এই উচ্চমূল্যকে কৃষকের স্বার্থে কাজে লাগানোর ব্যর্থতাই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।

ন্যায্যমূল্য পাওয়ার এই ব্যর্থতার কারণে ধানের দাম বাড়লেও কৃষকরা তাই খরচ উঠাতে পারে না। কারণ ফসলের দামের উপরে তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই লাক্স সাবানের মতো তারা তাদের পণ্যের দাম উৎপাদন খরচ অনুযায়ী

প্রয়োজনানুসারে বাড়াতে পারে না। এই কারণে তারা দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না।

দীর্ঘদিনের এই দারিদ্র্যের চক্রটিকে ভাঙ্গার চেষ্টা হচ্ছে পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে। মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে বিদেশে। অনেকে ঋণ নিয়ে অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করছে।

ফলে কৃষক হারাচ্ছে তার মূল পেশার প্রতি আগ্রহ। এই পেশা যদি তাকে সঠিক আয় দিতে পারতো, তাহলে এই পেশাও একদিন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের পেশার মতো সামাজিক মর্যাদা পেত। কিন্তু তার এই পেশার প্রতি কৃষকের অনাগ্রহের কারণে পরোক্ষভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে কৃষি প্রবৃদ্ধি।

তাই পর পর কয়েক বছর যদি কৃষক তার শস্যের ন্যায্যমূল্যটি পেত, তাহলে কৃষকদের এই অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতো। আমরা খেয়াল করলে দেখব, কৃষকদের এই উচ্চমূল্য প্রাপ্তির একটি সুযোগ কিন্তু রয়েছেই। কারণ একই শস্যের মূল্য শহরে প্রায় দ্বিগুণ। তাই ভোক্তা একই শস্যের দাম দ্বিগুণ দিতে রাজি রয়েছে[১০]। তাই কৃষক এবং ভোক্তার মধ্যে যদি দুরত্ব কমানো যেত তাহলে কৃষক আরো বেশি মূল্য পেত, কিন্তু একইসাথে ভোক্তার খরচ বাড়তো না।

বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা ঘনত্বের কারণে এই সম্ভাবনা বরং দিন দিন বাড়ছে। আমরা আগেই বলেছি, বাংলাদেশে মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে দ্রব্যমূল্য বাড়বেই। এর কোন অন্যথা নেই। তাই কৃষকদেরকে যদি এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতার সুফল দেয়া যায়, তাহলে তাদের দারিদ্র্য কমবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

তাই এক কথায় বলা যায়, ফসলের দামের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ব্যর্থতাই দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ[১১]। এই ব্যর্থতা তৈরি হচ্ছে একটি কারণে। কারণটি হল কৃষক তার শস্যের মূল্য নিজে ঠিক করতে পারে না[১২]। সুতরাং, দারিদ্র্য বিমোচনের গতি আরো অনেক বাড়ানো যাবে যদি কৃষককে তার শস্যের মূল্য ঠিক করার ক্ষমতা দিয়ে দেয়া যায় এবং পর পর কয়েক বছর শস্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়।

[১০] অর্থনৈতিক পরভাষায় এই বিষয়টিকে বলা হয় Consumers' Wiilingness to Pay.

[১১] তবে অনেক কৃষকই আছেন যাদের অবস্থান কাশেম মিঞাদের মতো এতোটা দুর্বল নয়। বিশেষ করে যারা মহাসড়কের কাছে কিংবা শহরের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করেন, তাদের অনেকেই তাদের শস্যের অধিক মূল্য পাচ্ছেন। সেইসাথে এমন অনেক কৃষক আছেন যাদের জমির পরিমাণ যেমন বেশি তেমনি মজুদ করে রাখার ক্ষমতাও বেশি। এই ধরণের কৃষকদের দেন দরবার করার ক্ষমতা অন্যান্য কৃষকদের তুলনায় অনেক বেশি।

[১২] কৃষকরা কেন তাদের শস্যের মূল্য নিজেরা ঠিক করতে পারে না তা আমরা কাশেম মিঞার গল্পে দেখিয়েছি। দেশের কাঠামোগত এই সকল সীমাবদ্ধতা দুর করা গেলে কৃষক তার পণ্যের মূল্য নিজেই ঠিক করতে পারবে।

এখানে অর্থনীতিবিদরা বলতে পারেন কৃষকরা যে বাজারে লেনদেন করে, সেই বাজার Price Takers Market। তাই তাদের শস্যের মূল্যের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা নয়।

এই ধরণের বক্তব্যে আমাদের ভিন্নমত রয়েছে। কাশেম মিঞার গল্পেই আমরা দেখিয়েছি শস্যের বাজার পুরোপুরি প্রতিযোগীতামূলক নয়। এখানে মূল্য নির্ধারণে যোগান এবং সরবরাহের বাইরেও আরো অন্যান্য অনেক বিষয় কাজ করে যা বাজারের প্রতিযোগীতাকে কমিয়ে দেয়।

কাশেম মিঞার যদি তার ফসলের দাম ঠিক করার ক্ষমতা থাকতো তাহলে তিনি দীর্ঘদিন ধরে তার শস্যের মূল্য সঠিকভাবে পেতেন। ফলে তার দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি সঞ্চয় থাকতো। তাই একই পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়েও তার অবস্থা হতো আরও ভাল। ফলে তিনি সিদ্দিক মিঞার সাথে বিরোধ নিয়ে তেমনটা চিন্তিত হতেন না। বরং হয়তো এই পরিস্থিতিরই উদ্ভব হতো না। কারণ তখন কাশেম মিঞার আর্থিক শক্তিকে সিদ্দিক মিঞা ভয় পেত।

বেশি সঞ্চয় থাকলে মহাজনের উপর তার নির্ভরতা কমতো। ফলে সার, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষি উপকরণের বেশি দামও তিনি বহন করতে পারতেন। বরং ফসলের দাম ঠিক করার ক্ষমতা নিজের হাতে থাকাতে এই সকল উপকরণের দাম বেড়ে গেলে তিনি শস্যের দামও আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে দিতেন। ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির চাপটি বহন করতো ভোক্তা, কৃষক নয়।

তার সঞ্চয় বেশি থাকলে তিনি বেশী ঝুঁকি নিতে পারতেন। ফলে তিনি সবসময় খোঁজখবর নিতে পারতেন তার শস্যের মূল্য শহরে কেমন আছে, এবং সেইমতো তার কৌশল ঠিক করতে পারতেন। তাই তাকে সোলেমান কিংবা মোখলেসের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো না।

মূল্য ঠিক করার ক্ষমতা নিজের হাতে থাকলে কাশেম মিঞা তার লাভ তার ঝুঁকির অনুপাতে তিনি নিজেই ঠিক করতে পারতেন এবং এই লাভ দেখে বিভিন্ন ব্যাংক তাকে ঋণ দিতে উৎসাহিত হতো। ফলে তিনি বের হতে পারতেন মহাজনের উচ্চসুদের ঋণের কবল থেকে। তাই তার জীবনযাএার মানের উন্নয়ন ঘটতো।

তার যদি অধিক সঞ্চয় থাকতো, তাহলে তিনি এবং তার পরিবার পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পারতেন। ফলে রোগ বালাইয়ের প্রকোপও কম হতো এবং তার পরিবারের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতো। সেইসাথে তার সন্তানদেরকেও তিনি

লেখাপড়া করাতে পারতেন কারণ কৃষি কাজ করার জন্য তিনি অন্যান্য শ্রমিক ভাড়া করতে পারতেন। ফলে তার সন্তানদেরকে কৃষি কাজে সময় ব্যয় করতে হতো না।

তাই অর্থনৈতিক পরিভাষায় বলা যায়, **দারিদ্র্য বিমোচনের গতি আরো অনেক বাড়ানো যাবে যদি কৃষককে তার শস্যের মুল্য ঠিক করার ক্ষমতা দিয়ে দেয়া যায় এবং পর পর কয়েক বছর শস্যের ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করা যায়, Ceteris Paribus। এটি নিশ্চিত করার জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতিই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন বাজার ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ।**

এটাই দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেলের মুল তত্ব বা Theory of Accelerated Poverty Reduction।

অনেকে এই তত্বের সমালোচনাতে বলতে পারেন, সমাজের সকল দরিদ্রের কৃষি জমি নেই এবং সকল দরিদ্রই কৃষি পেশার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই দারিদ্র বিমোচনের যে তত্ব দেয়া হয়েছে, তা পুরোপুরি ঠিক নয়।

হ্যা। এই ধরণের যুক্তি গ্রহণযোগ্য। তবে গ্রামাঞ্চলে কৃষির উপরই নির্ভর করে সার্বিক অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য। কৃষিখাতে যদি টাকার প্রবাহ আরো বাড়ানো যায়, তাহলে তা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য খাতকে প্রভাবিত করবে। ফলে উন্নত হবে সামগ্রিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

এই তত্বে শুধুমাএ কৃষকদের সমস্যার নিরসনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষকদের চেয়েও দরিদ্র শ্রেণী আছে যাদের কোন কৃষি জমি নেই। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণের যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা কাজ করে হতদরিদ্রদের নিয়ে। তাই অনেকে বলতে পারেন, শুধুমাএ কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন করে সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়।

এর প্রতি উওরে আমরা বলব, আমাদের এই তত্বে প্রতিটি কৃষক পরিবারকে এক একটি Business Unit হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি কৃষকই আসলে একজন একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। একজন শিল্প মালিককে সাহায্য করলে যেমন সেই শিল্পের সকল শ্রমিক উপকৃত হয়, তেমনি প্রতিটি কৃষকের আয় যদি বাড়ানো যায়, তাহলে কৃষির উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল পুরো জনগোষ্ঠীরই উন্নয়ন সম্ভব।

এই তত্ত্বের মাধ্যমে এটা বোঝানো হয়েছে যে প্রতিটি কৃষক পরিবার আসলে এক একটি Very Small Enterprise (VSEs)। এদের জমি রয়েছে, পেশাগত দক্ষতা রয়েছে, প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এরপরও এই সকল VSE গুলোর মেরুদন্ড শক্ত হচ্ছেনা বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে।

সমাজে এদের আর্থিক ভিত্তি Small and Medium Enterprise (SMEs) গুলো থেকেও দুর্বল। তাই সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা লক্ষাধিক VSE'র ক্ষমতায়ন যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন হবে অনেক দ্রুত গতিতে। প্রস্তাবিত দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন তত্ত্বের এটাই হল মূল ভিত্তি।

আবার অনেক অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখাতে পারেন, অতীতে গবেষণাতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের Regression Analysis করে দেখা গেছে কৃষি আয়ের সাথে দারিদ্র্য বিমোচনের হারের খুব একটা শক্তিশালী সম্পর্ক নেই। এর চেয়ে বরং বেশি প্রয়োজন গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিদ্যুতায়ন।

এখানে আমরা বলব এই সকল গবেষণাতে ধরে নেয়া হয়েছে কৃষক তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের যুক্তি হল কৃষকের আয়ের যে সকল তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন গবেষণাতে বিশেষণ করা হয়েছে তা অতিমাত্রায় অবমূল্যায়িত। তাই এই ধরণের অবমূল্যায়িত তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

তবে আমাদেরকে শুধু তত্ত্ব বললেই হবে না। বরং তত্ত্বের স্বপক্ষে আমাদেরকে প্রমাণ দিতে হবে। আমরা আগেই বলেছি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ধরে নেয়া হয়েছে বাজারকে যদি মুক্তভাবে চলতে দেয়া হয়, তাহলে বাজারে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে লাভবান হবে কৃষক, ভোক্তাসহ সকলেই। তাই প্রস্তাবিত এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে দেখাতে হবে যে মুক্তবাজার অর্থনীতি কৃষকদের ক্ষমতায়ন ঘটাবে না এবং শস্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে না।

এটি যদি প্রমাণ করা যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলোর অবস্থান দুর্বল হয়ে যাবে। আমরা আগেই বলেছি, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের অবস্থান হল বাজারকে যদি নিজের মতো চলতে দেয়া যায়, তাহলে উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে দুরত্ব কমে আসবে। সেইসাথে মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপটও কমে আসবে। কারণ প্রতিযোগীতার কারণে তারা তাদের লাভ কমিয়ে আনতে বাধ্য হবে। ফলে লাভবান হবে কৃষক এবং ভোক্তাসহ সকলেই।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাজারকে নিজের মতো চলার সুযোগ তো দেয়া হয়েছে। তাহলে বাজার কি আগের চেয়ে আরো Efficient হয়েছে?

না হয়নি। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে তা হয়নি।

৭. তত্ত্বের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ

আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি, দীর্ঘদিন ধরে বাজারকে নিজের মতো চলতে দিয়েও বাজার Efficient হয়নি, তাহলেই আমাদের এই তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

এই তত্ব প্রমাণ করতে হলে আমাদেরকে দেখাতে হবে কৃষকের দেনদরবার করার ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে না, এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সুফল বেশির ভাগই পাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। ফলে ভোক্তা এবং উৎপাদকের দুরত্ব দিন দিন কমছে না। এর জন্য আমাদেরকে দুটি সময়কালে কৃষক তার পণ্যের খুচরা মূল্যের যতো অংশ পায়, তার তুলনা দিতে হবে। অর্থাৎ, আমাদেরকে বের করতে হবে একটি শস্যে কৃষক খুচরা মূল্যের কতটুকু ভাগ পায় (বা Farmers' Share in Retail Prices) এবং দেখাতে হবে এই অংশ দিন দিন কমছে।

এটি প্রমাণ করার জন্য আমরা দুটি গবেষণার ফলাফল তুলনা করব।

প্রথম গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৪ সালে Journal of Applied Sciences এ। এই গবেষণাটি করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেইন, মোহাম্মদ নুরুল হুদা, মোসাম্মাত ইসমাত আরা বেগম, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান খান, এবং দিনাজপুর সরকারী ভেটেরিনারী কলেজের মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী[১৩]। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হলেও এই গবেষণাটি মুলত করা হয়েছিল ১৯৯৯ সালে।

দ্বিতীয় গবেষণাটি করেছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষকরা ২০০৭ সালে[১৪]। এই গবেষণাটি করেছিলেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান এবং তাদের গবেষণা টিমে ছিলেন অন্যান্য গবেষকরা।

এই দুটি গবেষণার ফলাফলের তুলনা আমরা নীচের সারণিতে করেছি। এই তুলনায় আমরা শুধু চালের বাজারের মার্কেটিং চ্যানেল এবং কৃষক এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের খুচরা মূল্যে অংশ তুলনা করেছি কারণ বাংলাদেশে চালের

[১৩] **গবেষনাটির শিরোনাম** "A Study on Price Spreads of Major Crops in Selected Markets of Bangladesh".
[১৪] **গবেষনাটির শিরোনাম** "Price of Daily Essentials: A Diagnostic Study of Recent Trends – Overview and Summary".

বাজারকেই সবচেয়ে বেশি Efficient ধরা হয়। তাই চালের বাজারের দুর্বলতা আবিস্কার করা গেলে একই ধাচের দুর্বলতা অন্যান্য শস্যের বাজারেও রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

১৯৯৯ সালের গবেষণার ফলাফল	**২০০৭ সালের গবেষণার ফলাফল**
১. এই গবেষণায় বিভিন্ন শস্য পণ্যের মার্কেটিং চ্যানেল এবং মার্কেটিং মার্জিন হিসাব করা হয়েছিল। এর জরিপ এলাকা ছিল শেরপুর, জামালপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি এলাকা।	১. এই গবেষণার উদ্দেশ্যও ছিল প্রায় একই রকম। এই গবেষণার আওতায় গবেষকদল সার্ভে করেছিলেন ১২ টি জেলার ৪৪ টি স্পট।
২. চালের বিপণনে ৪টি মার্কেটিং চ্যানেল রয়েছে। অর্থাৎ, চাল কৃষকের হাত হতে চার রকম পথে ভোক্তার হাতে পৌঁছায়। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথটি হচ্ছে কৃষক–চালকল–খুচরা বিক্রেতা–ভোক্তা। সবচেয়ে দীর্ঘ রুটটি হচ্ছে কৃষক–ফড়িয়া–বেপারী–চালকল আড়তদার/পাইকারী বিক্রেতা–খুচরা বিক্রেতা–ভোক্তা।	২. চালের বিপণনে ৮টি মার্কেটিং চ্যানেল রয়েছে। অর্থাৎ, চাল কৃষকের হাত হতে আট রকম পথে ভোক্তার হাতে পৌঁছায়। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথটি হচ্ছে কৃষক–চালকল–আড়তদার–খুচরা বিক্রতা–ভোক্তা।
৩. সবচেয়ে দীর্ঘ রুটে খুচরা মূল্যে কৃষকের অংশ বা Farmer's Share in Retail Price যথাক্রমে ৭১.৫% (আমন) এবং ৭০.৯% (বোরো)। সবচেয়ে স্বল্প রুটে কৃষকের অংশ যথাক্রমে ৮২.৩% এবং ৮২.৬%।	৩. খুচরা মূল্যে কৃষকের অংশ বা Farmer's Share in Retail Price প্রায় ৬১.২%। গবেষণাটিতে শুধু এই একটি হিসাব দেখানো হয়েছে।
৪. খুচরা মূল্যে চাতাল মালিকদের অংশ যথাক্রমে ৭.৯৫% (আমন) এবং ৯.১৮% (বোরো)[১৫]।	৪. খুচরা মূল্যে চাতাল মালিকদের অংশ ২২.৯%।

[১৫] ১৯৯৯ এর গবেষণার ৪, ৫ এবং ৬ নং পয়েন্ট গবেষণাটি থেকে হিসাব করে বের করা হয়েছে।

৫. চাতাল মালিকদের খরচ খুচরা মূল্যের ৫.৬৪% (আমন) এবং ৬.৭১% (বোরো)।	৫. চাতাল মালিকদের খরচ খুচরা মূল্যের ২.৩% মাএ।
৬. আমন এবং বোরোর খুচরা মূল্যে ফড়িয়া, আড়তদার এবং খুচরা বিক্রেতার অংশ যথাক্রমে ৩.৩২% (আমন) এবং ৩.৮৮% (বোরো); ২.৯৭% (আমন) এবং ৩.৩০% (বোরো); ৩.৬৩% (আমন) এবং ৪.০২% (বোরো)।	৬. ফড়িয়া, আড়তদার এবং খুচরা বিক্রেতার অংশ যথাক্রমে ০.৭%, ০.৭% এবং ১২.২%। যে সকল পাইকারী বিক্রেতা খুচরাও বিক্রি করে, খুচরা মূল্যে তাদের অংশ ৮.৮%।

উপরের দুটি গবেষণার তুলনার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হল। সত্যগুলি হলঃ

১. চালের বিপণনে ১৯৯৯-২০০৭ সময়কালে ৪টি অতিরিক্ত মার্কেটিং চ্যানেল বা রুটের উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা বেড়েছে। এটি প্রত্যাশিত। কারণ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবে তা-ই ঘটেছে।

২. মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা বাড়া বাজারে বেশি প্রতিযোগীতার ইঙ্গিত দেয়। মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা যতো বৃদ্ধি পাবে, কৃষকের দেন দরবার করার ক্ষমতা ততো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই গবেষণার তুলনাতে তা দেখা যায়নি। ১৯৯৯-২০০৭ সময়কালে মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা বাড়ার সুফল কৃষক পায়নি। ১৯৯৯ সালে খুচরা মূল্যে কৃষকদের অংশ যখন ৭০-৭১% ছিল, ২০০৭ সালে সেই অংশ কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬১%।

৩. এই তিন বছর সময়কালে সবচেয়ে লাভ বেড়েছে চাতাল মালিক এবং খুচরা বিক্রেতাদের। ১৯৯৯ সালে খুচরা মূল্যে তাদের অংশ যখন ছিল

যথাক্রমে ৮-৯% এবং ৩-৪%, ২০০৭ সালে সেই অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে প্রায় ২৩% এবং ১২% এ!

৪. ১৯৯৯ সালে খুচরা মূল্যে চালকল মালিকদের খরচের অংশ ছিল ৫-৭%, সেই অংশ ২০০৭ সালে কমে দাড়িয়েছে ২.৩% মাত্র।

৫. ১৯৯৯ এবং ২০০৭ মধ্যবর্তী সময়কালে স্বাভাবিকভাবেই চাতাল এবং খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। তাই তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতাও বেড়েছে। কিন্তু এই প্রতিযোগীতার কারণে তাদের লাভ কমেনি, বরং বেড়েছে যা মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়মকানুনের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ, ফড়িয়া এবং আড়তদারদের খুচরা মূল্যে অংশ এই তিন বছরে প্রত্যাশিতভাবেই কমেছে।

৬. এই আট বছর সময়কালে কৃষকরা খুচরা মূল্যে তার অংশ হারিয়েছে প্রায় ১০%। অথচ চাতাল মালিকদের অংশ বেড়েছে প্রায় ১৩% এবং খুচরা বিক্রেতার অংশ বেড়েছে প্রায় ৮% ।

৭. এই আট বছর সময়কালে ফড়িয়া এবং আড়তদাররা খুচরা মূল্যে অংশ অনেকখানি হারিয়েছে। এর অর্থ চাতাল মালিক এবং খুচরা বিক্রেতারা কৃষকদের হারিয়ে যাওয়া ১০% খুচরা মূল্যের অংশ তো নিচ্ছেই, তারা অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের অংশেও ভাগ বসাচ্ছে।

উপরের তথ্যগুলির মাধ্যমে এই কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে কৃষকদের দেন দরবার করার ক্ষমতা বাড়েনি যা প্রত্যাশিত ছিল। অথচ এই সময়কালে তথ্যের আদান প্রদান বেড়েছে। বেড়েছে প্রতিযোগীতাও। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, তাদের এই দেন দরবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে চলে গেছে চাতাল মালিক এবং খুচরা বিক্রেতাদের হাতে। অর্থাৎ, কাশেম মিঞারা ক্ষমতাহীন হয়েছে, কিন্তু এর পরিবর্তে ক্ষমতাবান হয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীরা।

এই ধরণের একটি উপসংহারের বিপরীতে অনেকেই বলতে পারেন, শুধুমাত্র খুচরা মূল্যে কৃষকের অংশ তুলনা করে সম্পূর্ণ বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে এই ধরণের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিপদজনক।

কারণ, খুচরা মূল্যে কৃষকের অংশ বাড়লেই তা ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করছে, তা নাও হতে পারে। যেমন, সরকার যদি পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং কৃষকদের কাছ

থেকে ১৫ টাকা কেজি দরে চাল কিনে তা আবার ভোক্তার কাছে একই দরে বিক্রি করে, তাহলে কৃষক খুচরা মূল্যের অংশ পাচ্ছে ১০০%। কিন্তু তার মানে এই নয় কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। এমন হতে পারে, সরকার যে মূল্য ঠিক করেছে, তা বৈষম্যমূলক।

আবার, কৃষকের কাছ থেকে শস্য কিনে তা টিনজাত করে বিক্রি করলে স্বভাবতই সেই টিনজাত পণ্যের খুচরা মূল্যে কৃষকের অংশ হবে অনেক কম। তবে তার মানে এই নয় যে বাজার ব্যবস্থায় সমস্যা রয়েছে।

সেইসাথে এটাও বলা যায়, মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকের কাছ থেকে শস্য কিনে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেই শস্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়। ফলে এতে তাদের খরচ রয়েছে যা মার্কেটিং মার্জিনে প্রতিফলিত হয়। তাই মার্জিন বেড়ে গেলেই কোন বিশেষ মধ্যস্বত্বভোগীর একচ্ছএ আধিপত্যের সৃষ্টি হচ্ছে, এই ধরণের সিদ্ধান্ত সঠিক না-ও হতে পারে।

এই ধরণের যুক্তির বিপক্ষে আমরা বলব, আমাদেরকে প্রথমেই দেখতে হবে আমরা একই পণ্যের তুলনা বার বার দিচ্ছি কিনা। এখানে পাঠকরা খেয়াল করুন, আমরা ১৯৯৯ সালে যে চালের মূল্যের তুলনা করেছি, ২০০৭ এ এসে সেই একই চালের বাজার মূল্যের উলেখ করেছি। এই সময়কালে বাজারে চালের মান এবং বাজারজাতকরণে গুণগত কোন তফাত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়না।

এই সময়কালে খুচরা ব্যবসায়ীরাও আমাদেরকে এমন কোন অতিরিক্ত সেবা দিচ্ছে না, যা তারা আগে দিত না। সাম্প্রতিককালে নন্দন, আগোরার মত আধুনিক খুচরা দোকানের উদ্ভব হলেও তা বাজারের একটি সাধারণ প্রবণতা নয়। এই সময়কালে চালকল মালিকরাও যে কোন প্রকার অতিরিক্ত সেবা যোগ করেছে, তাও সত্য হওয়ার কথা নয়।

তাই এই সময়কালে চালকল মালিকদের খুচরা মূল্যে খরচের অংশের সাথে তাদের মোট মার্জিনের তুলনা থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় বাজারে তাদের একচ্ছএ আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাজারে প্রতিযোগীতা না বেড়ে বরং আরো কমে গেছে।

খুচরা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছে কিনা তা বোঝা যাবে না তাদের খুচরা মূল্যে খরচের অংশ বের করা না গেলে। তবে চাতাল মালিকদের খুচরা

মূল্যে খরচের অংশ থেকে অন্তত এটা অনুমান করা যায়, খুচরা ব্যবসায়ীদের খুচরা মূল্যে খরচের অংশ চাতাল মালিকদের চেয়েও কম হবে। কারণ চালের বিপণনে সবচেয়ে বেশি খরচ করতে হয় চাতাল মালিকদেরকেই।

এখন প্রশ্ন হল, এই অল্প সময়কালে চাতাল মালিক এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের খুচরা মূল্যে নেট মার্জিনের অংশ হঠাৎ করে এতো বেড়ে গেল কেন?

আমাদের মতে, এর সম্ভাব্য উওরগুলি হলঃ

১. চাতাল কল মালিকদের মধ্যে সত্য সত্যই একটি ছায়াজোট গড়ে উঠেছে এবং তারা বাজারে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। এর কারণ সাম্প্রতিককালে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের বিস্তার হয়েছে অনেক ব্যাপক হারে। আমাদের দেশে মোবাইলের বিস্তার ঘটে মূলত ১৯৯৬ সালের পর থেকে। ২০০০ সালের মধ্যে দেশে অনেক মোবাইল অপারেটর ব্যবসা শুরু করে এবং মোবাইল সহজলভ্য হয়। ফলে সকলের হাতে হাতে পৌঁছে যায় মোবাইল ফোন।

   কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীরা যেহেতু কৃষকদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম, সেহেতু মোবাইলের সদ্ব্যবহার মধ্যস্বত্বভোগীরাই করছে বেশি। কৃষকরা জোটবদ্ধ না থাকায় তারা এর সুবিধা পাচ্ছে কম। ফলে বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের একটি আধিপত্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এই ধারা বজায় থাকলে আগামীতে এমন একটা সময় হয়তো আসবে যখন এই ছায়াজোট পরিণত হবে একটি ফর্মাল জোটে। তখন আমরা সারা দেশবাসী সত্য সত্যই এই জোটের কাছে জিম্মি হয়ে যাব।

   চালের বাজারের ক্ষেত্রে এই ধারাটি অন্যান্য দেশের বেলাতে নাও ঘটতে পারে কারণ বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে চাহিদাও অনেক বেশি।

২. সাম্প্রতিককালে বৃহত চাতাল কলগুলো আধুনিক চাল প্রক্রিয়াজাতের মেশিন স্থাপন করেছে। ফলে তাদের বিনিয়োগ হয়েছে বেশি। তাই তারা চাইছে চালের বিক্রয়মূল্যকে বাড়িয়ে তাদের বিনিয়োগ দ্রুত তুলে আনতে। তাই তারা বিক্রয়মূল্য বাড়ালে অন্যান্যরাও তাদেরকে অনুসরণ করছে। ফলে চাতাল কল মালিকদের নেট মার্জিন বেড়ে যাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে জনসংখ্যা ঘনত্ব খুব বেশি থাকায় এবং সেই সাথে সামগ্রিক আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে খাদ্যশস্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। খাদ্যশস্যের চাহিদার এই বৃদ্ধির কারণে খুচরা ব্যবসায়ীরাও তাদের লাভ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে উলেখ্য, কৃষি পণ্যের বিপণনে সবচেয়ে বেশী কম ঝুঁকি নিতে হয় খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে। কারণ তারাই প্রথম জানতে পারে বাজারে একটি পণ্যের চাহিদা কতটুকু। এই চাহিদা নিরূপণ করে তারা তাদের সেই অনুযায়ী অর্ডার দেয় পাইকারদেরকে। চাহিদা যদি কমে যায়, তাহলে তারা অর্ডারের পরিমাণও কমিয়ে দেয়। ফলে তাদের বিনিয়োগ আটকে থাকার ঝুঁকি অনেক কম।

উপরের কারণগুলির যে কোনটিই সত্যি হোক না কেন, এটি প্রমাণ করে যে আমাদের বাজার ব্যবস্থায় একটি বড় এুটি আছে।

এখন প্রশ্ন হল, কৃষকরা যদি দিন দিন ক্ষমতাহীন হতে থাকে, তাহলে কাশেম মিঞারা এই ব্যাপারটি বুঝতে পারছে না কেন?

আমাদের মতে, এর কারণ কাশেম মিঞারা বিগত বছরগুলোতে আগের বছরের তুলনায় শস্যের দাম বেশি পেয়েছে। তাই তাদের মনে এক অমূলক ধারণা হচ্ছে যে তাদের আয়ও বাড়ছে।

যেমন, ধরা যাক ১৯৯৯ সালে চালের খুচরা মূল্য ছিল ১৪ টাকা। ২০০৭ সালে সেই মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ টাকায়। তাই ১৯৯৯ সালে কৃষক পেত খুচরা মূল্যের প্রায় ৭০% বা ৯.৮০ টাকা। ২০০৭ এ এসে সে এখন পাচ্ছে খুচরা মূল্যের প্রায় ৬০% বা ১৬.৮ টাকা। তাই কৃষকের হিসাবে সে পণ্যমূল্য ২০০৭ এ এসে ১৯৯৯ এর তুলনায় বেশি পাচ্ছে।

কৃষক এতো গভীরে চিন্তা করে না। তাই সে মনে করে তার শস্যমূল্য আগের তুলনায় বেড়েছে এবং সে দিন দিন ভালই দাম পাচ্ছে। কিন্তু তার অজান্তে যে ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, সেদিকে কৃষক কেন, কারোরই নজর নেই।

তাই বছর শেষে কাশেম মিঞারা যখন হিসাব মেলায় তখন তারা বুঝতে পারে না কেন তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তাই তারা তাদের দুরবস্থার জন্য প্রথমেই দায়ী করে অন্যদেরকে, কিন্তু ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়াটাকে তারা দায়ী করে না। এই কারণে কোন গবেষকদল গ্রামে গিয়ে জরিপ চালালেও

জরিপের ফলাফলে তা বের হয়ে আসে না। ফলে গোপন সত্যটি গোপনই রয়ে যায়। প্রকাশ হয় না[১৬]।

এর সাথে আরও কয়েকটি কারণ অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে শস্যের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় ছিল কম। তাই আমাদেরকে আমদানী করতে হয়েছে। একই সাথে দেশে প্রবৃদ্ধিও হয়েছে মোটামুটি উচ্চ হারে। এই দুটি ফ্যাক্টর একসাথে হওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বিগত কয়েক বছরে বেড়েছে রীতিমতো লাফিয়ে লাফিয়ে[১৭]। কিন্তু এর বেশির ভাগ সুফল চলে গেছে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে। তাই বিগত কয়েক বছরে তাদের লাভ বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের ক্ষমতাও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যদি দেশে উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি হয়। মধ্যসত্বভোগীদের ক্ষমতা যেহেতু বিগত কয়েক বছরে হঠাৎ করে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, সেহেতু তারা অতিরিক্ত উৎপাদনের দোহাই দেখিয়ে কৃষকদেরকে কম মূল্যে শস্য বিক্রি করতে বাধ্য করবে। কিন্তু মধ্যসত্বভোগীরা তাদের লাভ ঠিক রেখেই শস্যের মূল্য নির্ধারণ করবে। ফলে ভোক্তারা এই অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রত্যাশিত সুফল পাবে না।

তাই কাশেম মিঞারা বেশি উৎপাদন করলেও তারা মূল্য পাবে এতো কম যে তারা তাদের খরচই হয়তো উঠাতে পারবে না, কারণ তাদের শস্যের মূল্য তারা নিজেরা ঠিক করতে পারে না। তাই লাক্স সাবানের মতো নিজস্ব লাভকে নিশ্চিত করে একটি নিম্নতম দাম বা Floor Price নির্ধারণ করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের মুক্তবাজার অর্থনীতির পরামর্শ কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানকে আরো দুর্বল করেছে। তাহলে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে কি মুক্তবাজার অর্থনীতির তত্ব ভুল? আমরা কি তাহলে ষাট এবং সত্তর দশকের সেই রেশনের যুগেই ফিরে যাব যেখানে সরকার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো?

[১৬] তবে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের উন্নয়ন অন্বেষণের একটি গবেষণায় এই ব্যাপারটির উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে বিশ্বব্যাংকের নীতি পরামর্শের কার্যকারিতা নিরীক্ষণেও প্রমাণিত হয়েছে কৃষকদের প্রকৃত আয় দিন দিন কমছে।

[১৭] এখানে শুধুমাত্র দেশীয় পণ্যের কথাই বলা হচ্ছে। আমদানীকৃত পণ্যের দাম বাড়ার সাথে আন্তর্জাতিক মুল্য পরিস্থিতি দায়ী।

না। মুক্তবাজার অর্থনীতির তত্ব ভুল নয়। তবে বাজারকে পুরোপুরি মুক্ত করে দিলেই যে তা ঠিকভাবে কাজ করতে থাকবে, এই ধরণের ধারণাও ঠিক নয়।

বাজারের মুক্ত হয়ে সঠিকভাবে চলার ব্যর্থতার ব্যাপারটিকে বলা হয় বাজারের ব্যর্থতা বা Market Failure। এই ব্যর্থতাকে কাটাতে হলে সরকারকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। তবে সরকার শুধু ততোটুকুই হস্তক্ষেপ করবে যতোটুকু এই ব্যর্থতা কাটানোর জন্য দরকার। এর বেশিও নয়, কমও নয়। তাই বলা যায়, সরকারকে একটি মধ্যবতী অবস্থানে থাকতে হবে।

এখানে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের কর্মকর্তারা বলতে পারেন, বাজারকে আরো কিছুদিন মুক্তভাবে রাখলে এই ব্যর্থতাও ধীরে ধীরে কেটে যাবে। তাই সরকারকে হস্তক্ষেপ না করে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা উচিত।

তারা বলতে পারেন, সরকারকে বাজার ব্যর্থতা কাটানোর দায়িত্ব না নিয়ে বরং রাস্তাঘাটসহ গ্রামীণ অন্যান্য অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা উচিত। ফলে এমন একটা সময় আসবে যখন বাজার আরো Efficient হবে, ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভও কমে আসবে।

হ্যা। তাদের কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হল আমাদেরকে এভাবে কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে? ২০ বছর? ৩০ বছর? নাকি আরো বেশি?

আমাদের মতে, এই ধরণের অপেক্ষার কারণে মধ্যস্বত্বভোগীদেরই লাভ হবে বেশি। আগামীতে যদি অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখা যায়, তাহলে মানুষের আয় বাড়তে থাকবে। ফলে বাংলাদেশের কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়বে হু হু করে। আর এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে কাশেম মিঞারা বেশি দাম পাবেন ঠিকই, কিন্তু এর সবচেয়ে বেশি সুফল পাবে সোলেমানরা এবং খুচরা বিক্রেতারা।

অনেকে বলতে পারেন চাতালের লাভ বাড়লে অর্থনীতির তত্ব অনুযায়ী ভবিষ্যতে চাতালের সংখ্যা বাড়বে। তাই সংখ্যা বাড়লে তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে তাদের দেন দরবারের ক্ষমতাও কমবে। তাই অদুর ভবিষ্যতে চাতাল মালিকদের একচ্ছএ আধিপত্য কমবে।

কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। অর্থনীতির তত্বগুলি বইয়ে আসলে যেভাবে পড়ানো হয়, বাস্তবে তার প্রতিফলন ততোটা সহজে ঘটেনা। যেমন, আমাদের

দেশে যে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বমানের মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটের চাহিদা রয়েছে তা নিশ্চয়ই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছরই প্রচুর মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নিতে যান। এর জন্য তারা ব্যয় করেন লক্ষ লক্ষ টাকা।

আমাদের দেশে বিনিয়োগকারীদেরও অভাব নেই। সেইসাথে অভাব নেই ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোরও। কিন্তু বিরাট চাহিদা, অর্থ এবং বিনিয়োগকারীদেও অভাব না থাকা সত্বেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন বিশ্বমানের মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল কিংবা নার্সিং ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠেনি। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু আধুনিক হাসপাতাল গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তাদেরকে একেবারে বিশ্বমানের বলা যায় না।

এই ধরণের অবস্থার একটি কারণ হল, আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিনিয়োগযোগ্য টাকা থাকলেও কেউ এই ধরণের বিনিয়োগে উদ্যোগী হন না এই সকলের বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত নানাবিধ ঝুঁকির কারণে। এই ঝুঁকি সম্পর্কিত তাদের Perception যদি প্রত্যাশিত আয়ের তুলনায় না কমে, তাহলে ভবিষ্যতেও এই ধরণের বিনিয়োগে কেউ এগিয়ে আসবে না।

একই কথা প্রযোজ্য চাতাল ব্যবসার ক্ষেত্রেও। চাতাল ব্যবসা এমনই এক ব্যবসা যা চট করে শুরু করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন জমি এবং টাকা। সেই সাথে এই ব্যবসা লাভজনক হলেই যে শহুরে ব্যবসায়ীরাও এসে এই ব্যবসায় যোগ দেবেন, এই ধরণের ধারণাও ঠিক নয়। তাই লাভ বাড়লে এই খাতে হয়তো চাতাল মালিকদের সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু এতে এই খাতের অতিরিক্ত লাভ কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিযোগীতা সৃষ্টি না-ও হতে পারে। ফলে সোলেমানদেরকে কাবু করা সহজ নয়[১৮]।

তাই আমরা আশ্চর্য হব না যদি আগামীতে খুচরা মূল্যে কাশেম মিঞাদের অংশ ৫০% এ নেমে আসে, এবং সোলেমানদের অংশ ২৫%-৩০% এ উঠে যায়।

[১৮] অর্থনৈতিক পরিভাষায় এই ব্যাপারটিকে বলা হয় Entry Barrier বা বাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা।

৮. মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার কুফল

শস্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা কৃষক এবং ভোক্তার হাতে না থেকে যদি কোন বিশেষ মধ্যবর্তী শ্রেণীর হাতে চলে যায়, তাহলে বাজারে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই নেতিবাচক প্রভাব সবসময় বোঝা না গেলেও বোঝা যাবে সঙ্কটকালে। দেশে যখন উৎপাদন কম হবে, কিংবা আন্তর্জাতিক বাজারে যখন শস্যের মূল্য বেড়ে যাবে, তখন বাজারে মূল্যবৃদ্ধির এই সুফল সবচেয়ে বেশি পাবে এই মধ্যস্বত্বভোগীরা। ফলে কৃষকরা হবে বঞ্চিত।

বাজারে যখন শস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তখন সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়ে সেই সকল দরিদ্র মানুষ যাদের জীবনযাত্রা কৃষিখাতের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, কিন্তু যারা কোন কৃষি জমির মালিক নয়। কৃষিজমি না থাকাতে তাদের কোন শস্যভান্ডার থাকে না যা দিয়ে তারা দুর্দিনে চলতে পারবে। তাদেরকে চলতে হয় বাজার থেকে কেনা শস্য দিয়েই।

ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি এই সকল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য আরো বাড়িয়ে দেয়। এই প্রবণতা দেখা গেছে সাম্প্রতিককালে। বিগত ২০০৭-২০০৮ সময়কালে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য বাড়তে থাকে। জুলাই, ২০০৭ এ যে চালের পাইকারী মূল্য ছিল ১৮ টাকা কেজি, সেই চালই ভোক্তাকে মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে কিনতে হয়েছে প্রায় ২৯ টাকা কেজি দরে। ২০০৮ সালের শুরুর দিকে এই মূল্য প্রায় কেজি প্রতি ৩৪ টাকাতে পৌঁছায়।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই সময়ের চালের মোট উৎপাদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশে তখন আসলে চালের সরবরাহজনিত কোন সঙ্কট ছিল না। ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং বন্যার কারণে আমন ফসলের কিছুটা ক্ষতি হলেও তা বিরাট আকারের কোন ক্ষতির কারণ হয়নি। কিন্তু তারপরও চালের এই মূল্যবৃদ্ধি আটকানো যায়নি।

চাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মধ্যবিত্তরা যেমন বিপদে পড়েছেন, তেমনি শুধুমাত্র এই একটি কারণে এক বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে গেছে। তাই বিগত দশকগুলিতে অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্য বিমোচনে যে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল, তা অনেকখানিই ম্লান হয়ে গেছে বাজারের কাঠামোগত এই দুর্বলতার কারণে।

২০০৭-২০০৮ সময়কালে মূল্যবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেলেও কোন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। এর কারণ হতে পারে মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বাজারের কিছুটা সুবিধা এখন কৃষকও কিছুটা পায়। তাই মূল্যবৃদ্ধির কারণে কৃষকের লাভও বাড়ে। ফলে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে। এর সাথে রয়েছে অবাধ তথ্য প্রবাহের সুবিধা। আমরা এখন এমন একটা সময় অতিক্রম করছি যখন দেশের কোথায় খাদ্যাভাব দেখা দিলে তা আমরা নিমেষেই জেনে যাচ্ছি মুক্ত মিডিয়ার কারণে। ফলে সম্ভব হচ্ছে সরকারের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ।

কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে ১৯৪৩ সালে প্রায় একই রকম পরিস্থিতিতে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। ১৯৪১-১৯৪৩ সময়কালে সারা বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তা পর্যালোচনায় দেখা যায়, সেসময় খাদ্যের সরবরাহজনিত কোন প্রকার সঙ্কট না থাকলেও পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মা থেকে চাল আমদানী হবে না, শুধুমাএ এই কারণে সারা বাংলাতে চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। আর এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেখা দেয় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ।

এই দুর্ভিক্ষের ফলে সারা বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায়। এদের বেশির ভাগই ছিল খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষ যারা কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, কিন্তু যাদের কোন কৃষি জমি নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৪১-১৯৪৩ সময়কালে বাংলার কৃষক চালের খুচরা মূল্যে কত অংশ পেত? সেই সময়কালে মধ্যস্বত্বভোগীদেরও দৌরাত্ম কেমন ছিল? চালের যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল তার একটি বড় অংশ যদি কৃষক পেত তাহলে কি এই দুর্ভিক্ষ এড়ানো যেত? চালের এই মূল্যবৃদ্ধিজনিত যে লাভ হয়েছে, তা মূলত কারা পেয়েছে?

৯. বাংলাদেশ দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল

এখন কাশেম মিঞার গল্প থেকে আমরা তার সমস্যার কথা জানতে পারলাম এবং বুঝতে পারলাম তিনি কি কি কারণে ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই কারণগুলো চিহ্নিত করে আমাদেরকে এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

অনেকে বলতে পারেন কৃষকদেরকে যদি জোটবদ্ধ করা যায় তাহলে তারাও ফড়িয়াদের জোটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং এর ফলে শস্যের মূল্যে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে ফড়িয়াদের মত মোবাইল ফোনের পূর্ণ সদ্ব্যবহারও তারা করতে পারবে।

হ্যা। এটা যদি করা যায়, তাহলে তো খুবই ভাল। কিন্তু প্রশ্ন হল এই কাজটি কে করবে? এতোদিন ধরে বাজারকে মুক্তভাবে চলতে দেয়াতে কি গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে? শস্য মূল্যের উপরে কি কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

হয়নি। কারণ সমবায় সমিতি করার কথাটা বলা যতোটা সহজ, কার্যক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন অনেক কঠিন। এর কিছু কারণ আমরা কাশেম মিঞার গল্পে দেখিয়েছি।

আবার এভাবে জোটবদ্ধ হলেই কৃষকরা যে খুচরা মূল্যের একটি বৃহৎ অংশ আদায় করতে পারবে, তাও ঠিক নয়। কারণ কৃষকরা না হয় জোটবদ্ধ হয়ে ফড়িয়াদের কাছ থেকে একটি ভাল দাম আদায় করল। কিন্তু বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য তো রয়েই গেল। তারা শস্য মজুদ করে পরবর্তীতে আরো বেশি দামে তা ভোক্তার কাছে বিক্রি করবে। ফলে খুচরা মূল্যে কৃষকদের অংশের কোন পরিবর্তন হবে না।

এর উত্তরে আবার অনেকে বলবেন, না, কৃষকদেরকে যদি জোটবদ্ধ করা যায় তাহলে তারাও একদিন শহরে এসে তাদের শস্য বিক্রি করবে। ফলে ভোক্তা এবং কৃষকদের মধ্যে কোন দুরত্ব থাকবে না। তাই শস্যের খুচরা মূল্যে কৃষকরা একটি বড় অংশ পাবে।

হ্যা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যদি এটা করা যায় তাহলেও খুবই ভাল। তবে এতোদিন ধরে বাজারকে মুক্তভাবে চলতে দিয়ে এই ধরণের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও সারা দেশের আপামর কৃষকদের সংখ্যার তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল।

তাই এই সকল সমস্যগুলিকে একত্রিত করে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত মডেলটি ব্যাখ্যা করছি। তাই শুরুতেই আমাদেরকে দেখতে হবে সমস্যাগুলির একে একে সমাধান কি করে করা যায়ঃ

১. কাশেম মিঞাকে হাটে গিয়ে ধান বিক্রি করতে হয়। তাই সেই হাটে যদি এমন কোন জায়গা বা গুদাম থাকতো যেখানে কাশেম মিঞা তার ধান জমা করে রাখতে পারবেন এবং প্রথমদিন ভাল দাম না পেলেও দ্বিতীয় দিন তিনি হেটে এসে আবারো বিক্রি করতে পারবেন, তাহলে তার দেন দরবার করার ক্ষমতা আরো বাড়তো। কারণ তখন ফড়িয়ারা বেলা বেড়ে যাওয়ার সুযোগটা আর নিতে পারতো না। তাই আমাদের এমন একটা সিস্টেম গড়তে হবে যেখানে হাটে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থাকতে হবে যেখানে কাশেম মিঞা নিশ্চিন্তে তার শস্য জমা করে রাখতে পারবেন।

২. কিন্তু এতেও ফড়িয়াদের ক্ষমতা কমানো যাবে না কারণ তারা জানে কাশেম মিঞাদের আর্থিক অবস্থা। তাই দ্বিতীয় দিন কাশেম মিঞা এলেও ফড়িয়ারাও একজোট হয়ে দ্বিতীয় দিন একই দাম হাকাবে। যেহেতু কাশেম মিঞার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, সেহেতু তিনি একসময় পরাজয় স্বীকার করবেন। তাই আমাদের সিস্টেমে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে কাশেম মিঞাদের মতো দরিদ্র কৃষকরা যেন ফড়িয়াদের হাতে জিম্মি না থাকেন।

৩. কাশেম মিঞা জেনেছেন তার এই ধান চাল হয়ে শহরে বিক্রি হয় প্রায় দ্বিগুণ দামে। অথচ তারা সেই অতিরিক্ত দামের কোন সুফল পাননা বিভিন্ন সামাজিক অসুবিধার কারণে। তাই আমাদের সিস্টেমে এমন একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে কাশেম মিঞারা শহরের দাম জানতে পারেন এবং সেই মতো তাদের শস্যের দাম নির্ধারণ করতে পারেন।

৪. কাশেম মিঞা মোবাইল কিনতে চাননি কারণ তার মতে এতে কোন অতিরিক্ত লাভ নেই। তাই শুধু তথ্য পেলেই হবে না, একে কাজে

লাগানোর সঠিক উপায় থাকতে হবে। তাই আমাদের সিস্টেমে তথ্য প্রবাহ হতে হবে মোবাইলের তথ্য প্রবাহ থেকে অধিক কার্যকরী।

৫. কাশেম মিঞারা সারে ভর্তুকির কথা খালি শোনেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন না। সেইসাথে সারও তারা ঠিকমতো পান না। তাই আমাদের সিস্টেমে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে তারা সার সঠিকভাবে পান এবং সরকার যে তাদেরকে ভর্তুকি দিচ্ছে, সেটাও যেন তারা বুঝতে পারেন।

৬. ভোক্তা এবং উৎপাদকের মধ্যে দুরত্ব যতো কমবে, উৎপাদকও ততো লাভবান হবে এবং ভোক্তার খরচও ততো কমবে। তাই আমাদের সিস্টেমে এমন একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে কাশেম মিঞাদের সাথে ভোক্তার দুরত্ব হবে সবচেয়ে কম।

৭. শহরের দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কাশেম মিঞারা যদি লাভ বাড়াতে চান তাহলে তাদেরকে জানতে হবে শহরের লোকেরা তার পণ্যের জন্য সর্ব্বোচ্চ কতো মুল্য দিতে রাজি আছে। তাই আমাদের সিস্টেমে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে কাশেম মিঞাদের কাছে এই তথ্য সঠিকভাবে পৌঁছে।

এখন উপরের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত মডেলটি ব্যাখ্যা করছি।

দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল

এই মডেলের দুটি উপাদান।

এক, প্রতিটি কৃষকের একটি স্বতন্ত্র আইডি নাম্বার থাকতে হবে[১৯]।

দুই, প্রতিটি ইউনিয়নে এক বা একাধিক *শস্য বিক্রয় কেন্দ্র* বা Crop Sales Centre গড়ে তুলতে হবে। এটি হবে একটি বড় গুদামের মতো যেখানে কৃষকরা এসে তাদের শস্য জমা রাখতে পারবে। এই জমাকৃত শস্য প্রয়োজনমত কিনে নেবে বিভিন্ন আগ্রহী ক্রেতারা।

[১৯] সবার জন্য একটি স্বতন্ত্র আইডি নাম্বার না থাকা আমাদের এই গবেষণা দেরীতে শুরু করার একটি অন্যতম কারণ। বিগত তত্বাবধায়ক সরকার এই কাজটি সম্প্রতি সফলভাবে শেষ করেছে, যদিও আগের নির্বাচিত সরকারই চাইলে তা করতে পারতো।

সারা দেশে দুই ধরণের শস্য বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে। শহর এলাকার শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলি হবে আকারে কিছু বড়। এগুলি হবে চাহিদা কেন্দ্র বা Demand Centres (যেমন ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন এলাকা)। আর যেগুলি ইউনিয়ন পর্যায়ে থাকবে, সেগুলি হবে যোগান কেন্দ্র বা Supply Centres (যেমন বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল)।

প্রতিটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে ক্রেতাদের জন্য দুই ধরণের কাউন্টার থাকবে। এক ধরণের কাউন্টারে শস্য বিক্রি হবে খুচরা হিসাবে (যেমন ১-৫০ কেজি পর্যন্ত), এবং অন্য কাউন্টারগুলিতে শস্য বিক্রি হবে পাইকারী হিসাবে (উর্দ্ধ ৫০ কেজি)। চাহিদা কেন্দ্রগুলিতে খুচরা কাউন্টার তুলনামূলক বেশি থাকবে।

এই সকল শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে চালের সাথে সাথে গম, ডাল, পেঁয়াজ এবং নির্বাচিত শাকসব্জি বিক্রি করা হবে। তবে সকল পণ্য এখানে পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হবে এর সুফল শুধুমাত্র অতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

একটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্র থেকে আরেকটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে শস্য নিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কেট স্পেশালিস্ট নামে লাইসেন্সধারী কিছু গ্রুপ থাকবে। এদের কাজই হবে যোগান কেন্দ্র থেকে চাহিদা কেন্দ্রে শস্যের চালান নিশ্চিত করা। সংখ্যায় এরা অনেক থাকলেও তাদের লাভ অনেকটাই নিশ্চিত থাকবে কারণ চাহিদা কেন্দ্রে শস্য সরবরাহ শুধুমাত্র এরাই করতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না।

প্রতিটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্র ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে। কাউন্টারগুলিতে ব্যবহার করা হবে কম্পিউটার এবং তাতে থাকবে দরকারী সফটওয়্যার।

প্রতিটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের আওতায় কৃষকদেরকে এক বা একাধিক সমবায় সমিতির আওতায় আসতে হবে। কৃষকরা তাদের লেনদেন সম্পন্ন করবেন সমবায় সমিতির নিয়ম মেনে এবং সমিতির সদস্য হিসাবে। যেমন, একটি ইউনিয়নে যদি দুটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্র থাকে, তাহলে প্রতিটি কেন্দ্রের আওতায় দুটি সমিতি থাকবে। এই দুটি সমিতির আওতায় থাকবেন সেই অঞ্চলের সকল কৃষক।

এখন দেখা যাক, কাশেম মিঞারা কিভাবে এর থেকে উপকৃত হবেন।

১. একটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্র যখন গড়ে তোলা হবে তখন সরকার জেনে নিবে এলাকাতে কারা কারা কৃষক, কারা নয়, তাদের জমির পরিমাণ কতো, তাদের আর্থিক অবস্থা, ইত্যাদি[২০]।

২. এই তথ্যগুলি জানার পর সরকার কৃষকদেরকে সংঘটিত করে দুটি করে সমবায় সমিতি তৈরি করতে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

৩. প্রতিটি মৌসুমের কয়েক মাস আগে প্রতিটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকার কৃষকদের সারের চাহিদা জেনে নেবে। ফসল বোনার মৌসুমের সময় সরকার ডিলারের মারফত এই সার প্রতিটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবে। ডিলাররা তখন আর নিজেরা সার মজুদ করতে পারবে না। এতে বর্তমানে সারের চাহিদা নিয়ে প্রতি বছরই যে সঙ্কট চলে, তা দুর করা যাবে।

   এই সার ডিলাররা বিক্রি করবে শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং তা বিক্রি করা হবে শুধু আইডিধারী কৃষকদের কাছেই। ফলে সরকার জানতে পারবে ডিলাররা কি দামে সার বিক্রি করছে এবং কারা তা কিনছে। সেইসাথে সরকার হিসাব রাখতে পারবে কোনো ডিলার অবৈধ পথে সার পাচার করছে কিনা। সারাদেশব্যাপী শস্য বিক্রয় কেন্দ্র থাকাতে সরকার জানতে পারবে কোথাও কোন সারের সঙ্কট আছে কিনা, আর থাকলেও তা কতোটুকু।

৪. ফসল তোলা শুরুর আগে সমবায় সমিতির সদস্যরা বৈঠক করে ঠিক করবে এবারের নিম্নতম মূল্য বা Floor Price কত হবে। ফলে কোন কৃষক এর নীচে মূল্য নির্ধারণ করবেন না। এই নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে হিসাবে আনা হবে মোট খরচ, উৎপাদন এবং লাভ।

৫. ফসল তোলার সময় শুরু হলে কৃষকরা একে একে তাদের ধান চাতাল কলে চাল করে নিয়ে আসতে থাকবেন। এই চাল শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে জমা করা হবে। কৃষকরা তাদের একটি পণ্যমূল্য ঠিক করে দেবেন যা কম্পিউটার সিস্টেমে ঢোকানো হবে। ক্রেতাদেরকে এই মূল্যেই চাল কিনতে হবে।

[২০] এই তথ্য জানার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বিগত তত্বাবধায়ক সরকার সম্প্রতি কৃষক শুমারীর মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি সম্পর্কিত অনেক তথ্যই লাভ করেছে।

৬. যোগান কেন্দ্রে বেশির ভাগ শস্যই থাকবে পাইকারী সেকশনে। চাহিদা অনুযায়ী কিছু অংশ দেয়া হবে খুচরা সেকশনে।

৭. পাইকারী সেকশনের অন্যতম ক্রেতা হবেন মার্কেট স্পেশালিস্টরা যাদের দায়িত্ব এই চাল অন্য কোন চাহিদা কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া। এদের সাথে সরকারও তার আপদকালীন মজুদ হিসাবে চাল ক্রয় করবে কৃষকের নির্ধারিত দামে। এর সাথে অন্যান্যরাও যেমন স্থানীয় আড়তদার, চাতাল মালিক, ফড়িয়া এবং রপ্তানীকারকরাও এখান থেকেই চাল কিনবেন।

৮. মার্কেট স্পেশালিস্টরা তাদের কেনা চাল চাহিদা কেন্দ্রে নিয়ে আসার পর তাদের পরিবহন খরচ এবং লাভ যোগ করে একটি মূল্য নির্ধারণ করবেন যা কম্পিউটার সিস্টেমে ঢোকানো হবে।

৯. চাহিদা কেন্দ্রে এই চাল নিয়ে আসতে পারবেন একমাত্র মার্কেট স্পেশালিস্টরাই। ফলে এখানে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে যা তাদের লাভকে নিশ্চিত করবে। ফলে তারাও চাহিদা কেন্দ্রে শস্য যতো দ্রুত সম্ভব নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন। চাহিদা কেন্দ্রে এই চাল নিয়ে আসার পর এর একটি অংশ চলে যাবে খুচরা সেকশনে।

১০. চাহিদা কেন্দ্রের পাইকারী সেকশন থেকে চাল ক্রয় করবে স্থানীয় আড়তদার এবং খুচরা বিক্রেতারা। খুচরা সেকশন থেকে ক্রয় করবে স্থানীয় জনগণ।

এই মডেলটি বাস্তবায়িত হলে কৃষক এবং ভোক্তার মধ্যে দুরত্ব অনেকখানিই কমে আসবে। যেমন, সর্বাধিক প্রচলিত রুটটি হবে কৃষক–মার্কেট স্পেশালিস্ট–ভোক্তা। ফলে কৃষক তার ন্যায্যদাম পাবে এবং ভোক্তার পক্ষেও সম্ভব হবে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কেনা।

এই ব্যাপারটি দুটি লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

লেখচিএ ১

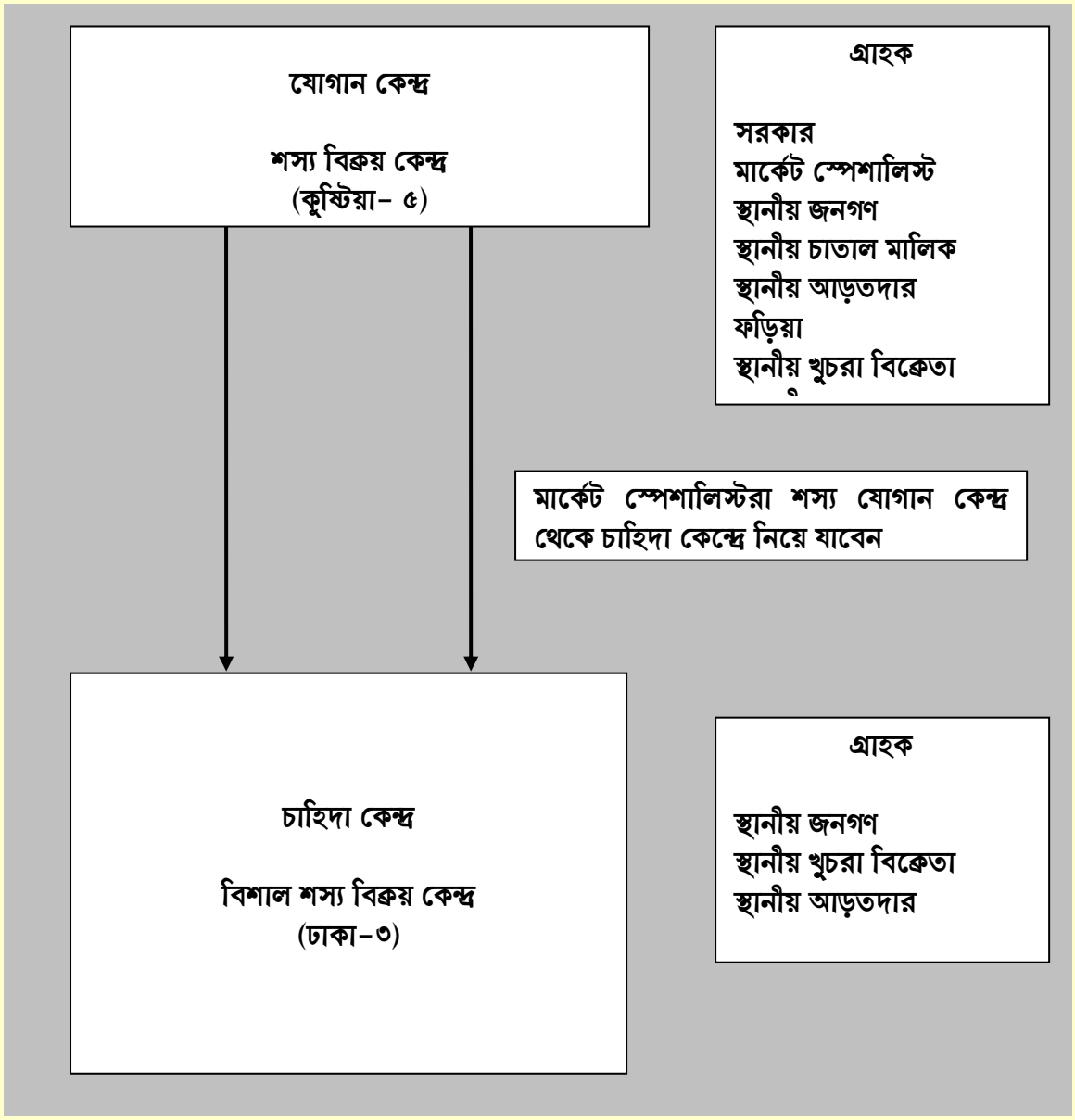
যোগান কেন্দ্র
শস্য বিক্রয় কেন্দ্র
(কুষ্টিয়া- ৫)
গ্রাহক
সরকার
মার্কেট স্পেশালিস্ট
স্থানীয় জনগণ
স্থানীয় চাতাল মালিক
স্থানীয় আড়তদার
ফড়িয়া
স্থানীয় খুচরা বিক্রেতা
মার্কেট স্পেশালিস্টরা শস্য যোগান কেন্দ্র থেকে চাহিদা কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন
চাহিদা কেন্দ্র
বিশাল শস্য বিক্রয় কেন্দ্র
(ঢাকা-৩)
গ্রাহক
স্থানীয় জনগণ
স্থানীয় খুচরা বিক্রেতা
স্থানীয় আড়তদার

লেখচিএ ২

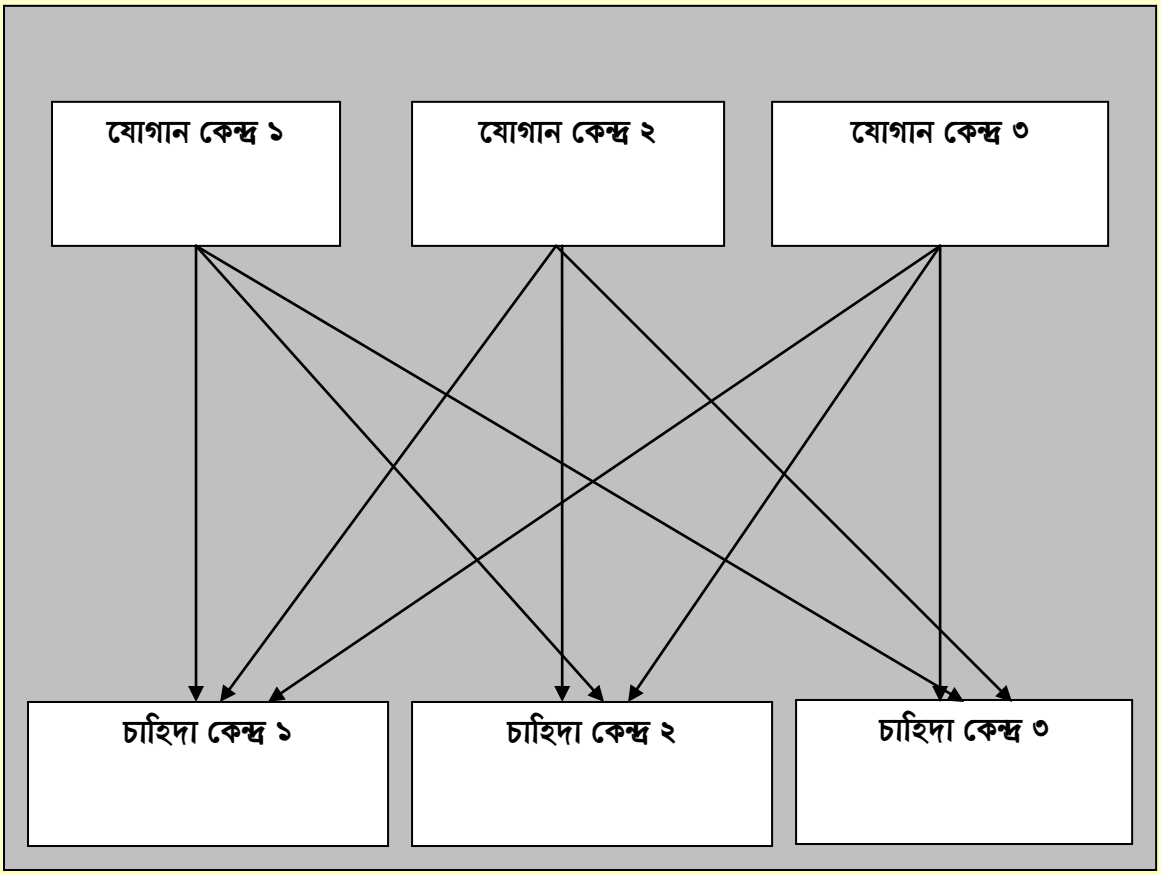

এখানে বলে রাখা দরকার, কাওরানবাজার এবং চাতাল কল ভিত্তিক সনাতনী বাজার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষকদেরকে তার শস্য মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া এবং ভোক্তা এবং কৃষকদের মধ্যে দুরত্ব কমানো।

এই সিস্টেম যখন সারা দেশে তৈরি করে ফেলা হবে তখন কাওরানবাজার এবং চাতাল ভিত্তিক সনাতনী বাজার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলির উপর। তবে এটি ঘটবে শুধুমাএ কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেএে কারণ সকল পণ্যের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা এই কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্য নয়।

শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা

প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কেন্দ্র হলে সারা দেশে মোট কেন্দ্র হবে প্রায় ৪০০০টি। দুটি করে হলে মোট কেন্দ্র হবে প্রায় ৮০০০টি। বিভাগীয় শহরগুলিতে জনসংখ্যা অনুপাতে একাধিক *বিশাল শস্য বিক্রয় কেন্দ্র* খোলা যায় যেমন ঢাকাতে খোলা যায় ৩–৪টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি।

মার্কেট স্পেশালিস্টের সংখ্যা

প্রতিটি কেন্দ্রে যে কেউ মার্কেট স্পেশালিস্ট হতে পারবেন। এর জন্য কোন প্রকার যোগ্যতার প্রয়োজন হবে না। ফলে কৃষকরাও যেমন মার্কেট স্পেশালিস্ট হতে পারবেন, তেমনি ফড়িয়া, বেপারী, চালকল মালিক এবং শহুরে জনসাধারণও, যারা আগে কখনো কৃষি পেশার সাথে জড়িত ছিলেন না, তারাও মার্কেট স্পেশালিস্ট হতে পারবেন।

তবে শর্ত হল এই যে, কোন ব্যক্তি যখনই শস্য কেনার সময় মার্কেট স্পেশালিস্ট হিসাবে কিনবেন, তখন তাকে শুধুমাএ চাহিদা কেন্দ্রতেই তা নিয়ে যেতে হবে। তিনি অন্যএ তা বিক্রি করতে পারবেন না। চাহিদা কেন্দ্রগুলিতে শস্য বিক্রি করতে পারবেন শুধু মার্কেট স্পেশালিস্টরাই। অন্য কাউকে এতে শস্য বিক্রয় করতে দেয়া হবে না।

তবে কেউ যদি যোগান কেন্দ্র থেকে শস্য কিনে অন্যএ বিক্রি করতে চান, তাহলে তাকে তা কিনতে হবে একজন সাধারণ ক্রেতা হিসাবে, মার্কেট স্পেশালিস্ট হিসাবে নয়।

মডেল বাস্তবায়নের খরচ

এই মডেল বাস্তবায়নের খরচ চার ভাগে বিভক্ত। এক, জাতীয় আইডি কার্ড প্রচলনের খরচ; দুই, ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসানোর খরচ; তিন, শস্য বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের খরচ, এবং চার, সফটওয়্যার তৈরী করার খরচ। এর মধ্যে জাতীয় আইডি কার্ড এবং ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসানোর কাজ এখনই চলছে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবল ছাড়াও সরকার সম্প্রতি সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস ইন্টারনেট প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনটি লাইসেন্স প্রদান করেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমেও সহজেই এই তথ্য আদান প্রদান করা সম্ভব।

তাই এই জাতীয় আইডি কার্ড প্রচলনের খরচ এবং ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসানোর খরচ প্রকল্পটির মোট খরচ থেকে বাদ দিতে হবে। এখন শুধু বাকি থাকে শস্য বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করার খরচ এবং সফটওয়্যার তৈরির খরচ।

শস্য বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করতে সবচেয়ে বেশি খরচ হবে ভূমি অধিগ্রহণে। তবে এই সমস্যা কাটানো যায় যদি সরকার খাস জমিতে এই শস্য বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করে। এর স্থাপনা নির্মানে খুব বেশি খরচের প্রয়োজন নেই। এটি নির্মাণে প্রতিটির জন্য যদি এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, তাহলে মোট খরচ হবে ৮০০০ কোটি টাকা। আর যদি দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, তাহলে খরচ হবে ১৬০০০ কোটি টাকা। তবে এই খরচ অনেকটা বাড়িয়ে ধরা হয়েছে কারণ বাংলাদেশে সকল ইউনিয়নে কৃষিকাজ হয় না।

এই স্থাপনাগুলির উপরে থাকবে টিনশেড, নীচে সাধারণ পাকা মেঝে, এবং মাঝে সাধারণ দেয়াল। কোন প্রকার বিলাসিতা এর মধ্যে থাকবে না। এর ভিত্তি হবে এমন যেন বন্যার সময় পানি না ওঠে। ফলে বন্যা হলে এটি ব্যবহৃত হতে পারে আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে।

সফটওয়্যার তৈরিতে কিছু খরচ হবে, তবে এটি এমন কোন জটিল সফটওয়্যার নয় যে এর জন্য বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনতে হবে। এই সফটওয়্যার দেশের আইটি বিশেষজ্ঞরাই তৈরি করে ফেলতে পারবেন।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্য প্রযুক্তিকে কিভাবে কৃষকের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, তার একটি মডেল নিচে দেয়া হল।

যোগান কেন্দ্র

কৃষকের আইডি নং	চালের ধরণ	পরিমাণ (কেজি)	নির্ধারিত মূল্য (টাকা/কেজি)
২২১১৩৪	নাজিরশাইল[২১]	৫০০	১৯
২২১১৫০	নাজিরশাইল	১০০০	২০
২২১১৬৯	নাজিরশাইল	৭০০	২০
২২১১৫৪	নাজিরশাইল	১২০০	২১

চাহিদা কেন্দ্র

মার্কেট স্পেশালিস্টের আইডি নং	চালের ধরণ	পরিমাণ (কেজি)	নির্ধারিত মূল্য (টাকা/কেজি)
৫৫০১৩৪	নাজিরশাইল	৩০০০	২৩
৩৪৩১৩০	নাজিরশাইল	৭০০০	২৪
২১৫১৪৯	নাজিরশাইল	৭০০০	২৪
৪০২১৮৪	নাজিরশাইল	৫০০০	২৫

এখানে পাঠকরা খেয়াল করুন, সবচেয়ে কম মূল্য যে কৃষক ধার্য করেছেন, তার ডাটা অটোমেটিক্যালি সবার উপরে চলে এসেছে। যে কৃষকের অবস্থা খারাপ, যার টাকার দরকার সবার চেয়ে বেশি, তিনি স্বভাবতই চাইবেন যে তার হাতে টাকাটা সবার আগে চলে আসুক। তার দেন দরবার করার ক্ষমতা কম বলে তিনি মূল্যও স্বভাবতই কিছুটা কম নির্ধারণ করবেন। তাই তিনি সবার পরে আসলেও তার শস্য বিক্রি হবে সবার আগে।

কিন্তু চাহিদা কেন্দ্রে অবস্থাটা একই রকম নয়। এখানে সেই মার্কেট স্পেশালিস্টের পণ্য সবার আগে সিস্টেমের উপরে উঠবে যিনি সবচেয়ে কম মূল্য ধার্য করবেন, অর্থাৎ যার প্রতিযোগীতার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। প্রতিযোগীতা করার ক্ষমতা তারই বেশি থাকবে যিনি সবচেয়ে কম খরচে যোগান কেন্দ্র থেকে চাহিদা কেন্দ্রে

[২১] এটি শুধুই একটি উদাহরণ। বাজারের বর্তমান মূল্যের সাথে এই মূল্য না-ও মিলতে পারে।

শস্য নিয়ে যেতে পারবেন। এর ফলে মার্কেট স্পেশালিস্টদের মধ্যে সবসময় একটি প্রতিযোগীতা থাকবে যা Market Efficiency বাড়াবে।

চাহিদা-যোগানের তথ্য এবং মুল্য নির্ধারণ

সনাতনী ব্যবস্থায় যেমন চাহিদার তথ্য খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আড়তদার হয়ে চালকল মালিকদের কাছে আসে এবং বাজারের মুল্য নির্ধারিত হয়, ঠিক তেমনি নতুন ব্যবস্থায়ও তথ্যটি খুচরা পর্যায় থেকে নীচের দিকে আসতে থাকবে। তবে এবার তা কাজে লাগাবে সোলেমানরা নয়, বরং কাশেম মিঞারা।

এর জন্য দুটি সূচক ব্যবহার করতে হবে। একটি হল Capacity Utilization এবং অপরটি Turnover।

Capacity Utilization বোঝাবে একটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে কতটুকু জায়গা খালি আছে তার পরিস্থিতি। এটি বের করার উপায় হলঃ

Capacity Utilization = (Present Stock/Total Capacity of the Centre) X 100

এটি শতকরায় প্রকাশ করা হবে। কোন কেন্দ্রের Capacity Utilization ৭০% এর অর্থ হল সেই কেন্দ্রে এখনো ৩০% জায়গা খালি আছে। চাহিদা কেন্দ্রের এই তথ্য দেখে মার্কেট স্পেশালিস্টরা বুঝবে কোন কেন্দ্রে শস্য নিলে তা জমা করার জন্য তাদেরকে ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে না।

তবে জায়গা খালি থাকলেই হবে না। শস্য তাড়াতাড়ি বিক্রিও হতে হবে। তাই শস্য যেখানে তাড়াতাড়ি বিক্রি হচ্ছে সেখানেই সবার আগে মার্কেট স্পেশালিস্টরা শস্য নিয়ে যেতে চাইবেন। এই তথ্যটি জানার জন্য সকল কেন্দ্রের জন্য Turnover হিসাব করতে হবে। এর মাধ্যমে জানা যাবে প্রতি ঘন্টায় কি পরিমাণ শস্য বিক্রি হচ্ছে। এটি বের করার উপায় হলঃ

Turnover = (Amount Sold in Kg/No of Hours)

দিনশেষে কোন একটি কেন্দ্রে Turnover ১০,০০০ কেজি এর অর্থ হল ঐ বিশেষ দিনে কেন্দ্রটিতে প্রতি ঘন্টায় ১০ টন শস্য বিক্রি হয়েছে।

এই দুটি তথ্যকে ব্যবহার করে মার্কেট স্পেশালিস্ট এবং কৃষকরা তাদের শস্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন।

যেমন কোন চাহিদা কেন্দ্র দ্রুত খালি হতে থাকলে মার্কেট স্পেশালিস্টরা তাড়াতাড়ি যোগান কেন্দ্রে ভিড় জমাবেন। তারা শস্য কিনতে থাকবেন। এই তথ্য আবার পাবে কৃষকরা। ফলে দামটা মূলত বাড়াবেন কৃষকরাই।

সার্বজনীন তথ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা

প্রতিটি শেয়ার মার্কেটে যেমন দিনের শেষে মূল্য সূচক বিতরণ করা হয় এবং তা পরদিন পত্রিকাতে ছাপা হয়, ঠিক তেমনি প্রতিটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের দিনের শেষে মূল্য পরিস্থিতি মিডিয়াতে দিয়ে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শস্যের আনুপাতিক গড় মূল্য বা Weighted Average Price প্রকাশ করা হবে।

যেমনঃ

১ম কৃষক – ৭০০ কেজি চাল – ২০ টাকা/কেজি
২য় কৃষক – ১২০০ কেজি চাল – ২১ টাকা/কেজি
৩য় কৃষক – ৩০০ কেজি চাল – ২৩ টাকা/কেজি

তাহলে আনুপাতিক গড় = (৭০০X২০ + ১২০০X২১ + ৩০০ X২৩)/(৭০০ + ১২০০ + ৩০০)

= (১৪০০০ + ২৫২০০ + ৬৯০০)/২২০০

= ২০.৯৫ টাকা/কেজি

সেইসাথে প্রতিটি কেন্দ্রের দিনশেষে Capacity Utilization এবং Turnover এর তথ্যও মিডিয়াতে প্রকাশ করা হবে। এর একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলঃ

চাহিদা কেন্দ্র	নাজিরশাইল	মিনিকেট	পাইজম	গম	Cap.Ut (%)	Turnover (kg/hr)
ঢাকা – ১	২৫	২৮	২৭	১৮	৮০%	৭০০০
ঢাকা – ২	২৫	২৯	২৫	১৮	৭০%	১০০০০
ঢাকা – ৩	২৪	২৯	২৬	১৭	৯০%	৬০০০
ঢাকা – ৪	২৪	২৯	২৭	১৬	৬০%	১২০০০
যোগান কেন্দ্র	**নাজির শাইল**	**মিনিকেট**	**পাইজম**	**গম**	**Cap.Ut (%)**	**Turnover (kg/hr)**
জামালপুর – ১	২২	২৫	২৩	১৫	৭০%	৮০০০
জামালপুর – ২	২১	২৬	২৩	১৫	৮০%	৯০০০
ময়মনসিং – ১	২২	২৫	২৪	১৬	৯০%	৫০০০
ময়মনসিং – ২	২২	২৫	২৪	১৫	৬০%	১৫০০০

আমাদের মনে হয় এই দুটি সারণি সাংবাদিকরা খুব আগ্রহ ভরে তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করবেন কারণ এই তথ্য পড়বে কৃষকসহ গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরা। ফলে পত্রিকার সার্কুলেশনও বাড়বে।

এই তথ্যগুলি নিয়মিত পেলে কৃষকরা জানতে পারবেন অন্যান্য যোগান কেন্দ্রগুলিতে কি দামে একটি শস্য বিক্রি হচ্ছে। ফলে সেইমতো তারা তাদের কৌশল ঠিক করে ফেলতে পারবেন। শুধু তাই নয়, একজন কৃষক জানতে পারবেন তার নিকটস্থ শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে এখন জায়গা খালি আছে কিনা। খালি না থাকলে তিনি অপেক্ষা করবেন। এই তথ্য তিনি মোবাইলের মাধ্যমেও জেনে নিতে পারবেন।

সারা দেশে এই সিস্টেমটি গড়ে তোলা গেলে ধীরে ধীরে ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যাবে। ফলে প্রতি ঘন্টার বাজার পরিস্থিতির আপডেট জানা যাবে। ফলে বাড়বে Market Efficinecy এবং Market Integration।

পরিচালন খরচ

একটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্র চালাতে মুল খরচ হবে স্টাফদের বেতন ভাতা বাবদ। বেতন ভাতার কারণে একটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্র চালাতে মাসিক খরচ কেমন হতে পারে, তার একটি হিসাব নীচে দেয়া হলঃ

পদ	সংখ্যা	মাসিক বেতন (টাকা)	মোট মাসিক বেতন (টাকা)
মহাব্যবস্থাপক	১	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ব্যবস্থাপক	২	৫০,০০০	১,০০,০০০
আইটি	২	৪০,০০০	৮০,০০০
বিশেষজ্ঞ	১০	১০,০০০	১,০০,০০০
সেলসম্যান	২০	৪,০০০	৮০,০০০
শ্রমিক	৫	১০০০	৫০০০
মোট	**৪০**		**৪,৬৫,০০০**

তবে এর বাইরেও কিছু খরচ রয়েছে যেমন বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, ইত্যাদি। তবে এই খরচ খুব একটা বেশি হওয়ার কথা নয়। এখন প্রশ্ন হল, এই মাসিক বেতন কি সরকার বহন করবে?

না। এই বেতন পরিচালকদেরকে শস্য বিক্রয় করার কমিশন থেকে উঠিয়ে আনতে হবে। এটি খুব সহজেই করা যায়। যেমন, প্রতি কেজি চালে যদি মাএ ৫০ পয়সা কমিশন রাখা হয় এবং একটি কেন্দ্রে এক মৌসুমে যদি ৫০০০ টন চাল বিক্রি হয়, তাহলে কমিশন আসবেঃ

কমিশন = ৫০০০ টন X ১০০০ কেজি X ০.৫০ টাকা = ২৫,০০,০০০ টাকা

এই কমিশন শুধু একটি মৌসুমে শুধুমাএ চাল বিক্রি করেই পাওয়া যাবে। এছাড়াও তারা সার বিক্রিতেও কমিশন বসাতে পারেন। অন্যান্য ফসল বিক্রি করলে এই কমিশন আরও বাড়বে। তাই ব্যবস্থাপকরা সবসময়ই চাইবেন যাতে কৃষকরা যেন

আরও বেশি বেশি পণ্য শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে লেনদেন করেন। ফলে বাড়বে পণ্যের সংখ্য।

তাই হিসাব করলে দেখা যাবে, পরিচালনা ব্যয় বাদে সরকার এই খাত থেকে লাভও করতে পারবে যা পরবর্তীতে কৃষকদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে।

এখানে বলা দরকার, এখানে সরকারের উদ্দেশ্য হবে লাভ করা নয়। বরং একটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্র যাতে সফলভাবে চলতে পারে, এবং সেই কেন্দ্রটি যাতে কৃষকদের কল্যাণে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

প্রতিটি কেন্দ্র চালানোর জন্য সরকার নতুন কর্মীদেরকে নিয়োগ দিতে পারে, আবার সরকারি কর্মকর্তাদেরকেও প্রেষণে দায়িত্ব দিতে পারে। এতে সরকারি কর্মকর্তারা অধিক আয়ের একটি সুবিধা পাবেন। সেলসম্যান পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রাজুয়েটদেরকে ইন্টারনশীপ অফার করা যায়। এতে স্বল্প খরচে কেন্দ্রগুলি চলতে পারবে, এবং সেইসাথে স্টুডেন্টরাও সুযোগ পাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের।

মার্কেটিং মার্জিন

এখন দেখা যাক, শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষের মার্জিন কেমন থাকবে।

ধরা যাক, কাশেম মিঞা শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে এসে তার মূল্য নির্ধারণ করলেন ২২ টাকা/কেজি। এর সাথে যোগ হবে কমিশন ৫০ পয়সা।

তাহলে মার্কেট স্পেশালিস্ট কিনবেন ২২.৫০ টাকা দরে। তার চাহিদা কেন্দ্রে চাল নিতে পরিবহন খরচ ধরা যাক ১০,০০০ টাকা। তিনি একটি ট্রাকে ৭ টন মাল নিতে পারবেন।

তাহলে প্রতি কেজিতে তার পরিবহন খরচ = ১০,০০০ টাকা/৭০০০ কেজি

= ১.৪২ টাকা/কেজি

তাহলে চাহিদা কেন্দ্রে নিতে তার মোট ব্যয় = ২২.৫০ টাকা + ১.৪২ টাকা

= ২৩.৯২ টাকা/কেজি

এখন তিনি হিসাব করে বের করলেন, তিনি যদি এই চাল ২৫ টাকা/কেজি দরে বিক্রি করেন, তাহলে ৭ টন মালে তার লাভ হবে (২৫ – ২৩.৯২) X ৭০০০ কেজি = ৭,৫৬০ টাকা

এই ২৫ টাকার সাথে কেন্দ্রের কমিশন যোগ করলে খুচরা মূল্য দাড়াবে ২৫.৫০ টাকা।

তাহলে খুচরা মূল্যে কৃষকের অংশ = (২২ টাকা/২৫.৫০ টাকা) X ১০০

= ৮৬.২৭%

মার্কেট স্পেশালিস্টের অংশ = (২.৫০ টাকা[২২]/২৫.৫০ টাকা) X ১০০
= ৯.৮০%

কেন্দ্রের অংশ = ১০০% – ৮৬.২৭% – ৯.৮০% = ৩.৯৩%

এখন দেখা যাচ্ছে, প্রস্তাবিত এই মডেলে কৃষকদের খুচরা মূল্যে অংশ বর্তমানের প্রায় ৬০% থেকে বাড়িয়ে প্রায় ৮৬% এ নিয়ে যাওয়া যায়। এই অংশ বাস্তবে ৯০% এরও অধিক করা যাবে কারণ মার্কেট স্পেশালিস্টের অংশ এবং কেন্দ্রের কমিশন এখানে অনেক বাড়িয়ে অনুমান করা হয়েছে। সরকার কেন্দ্রের লাভ হিসাব করে এই কমিশনের হার প্রয়োজনে কমাতে পারে।

এখানে উলেখ্য, বর্তমানে যে সকল অবস্থাপন্ন এবং শহরের কাছাকাছি থাকা কৃষক রয়েছেন, তারা হয়তো সরাসরি খুচরা বিক্রেতাদের কাছে চাল বিক্রি করছেন, এবং খুচরা মূল্যে একই পরিমাণ বা বেশি অংশ পাচ্ছেন। তবে এটি পুরো বাজারের চিএ নয়। এর সুফল পাচ্ছেন গুটিকয়েক কৃষক। কিন্তু প্রস্তাবিত মডেলে সকল কৃষকই যাতে বাজারের এই সুবিধা পায়, তার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা

বর্তমানে সরকার সার এবং ডিজেলে যে ভর্তুকি দিচ্ছে তা কৃষকদের কাছে কতটুকু পৌঁছাচ্ছে সেই ব্যাপারে অনেক মতভেদ রয়েছে। যেমন একটি গবেষণায় পাওয়া গেছে, অনেক অঞ্চলের কৃষক তাদের সেচকাজের জন্য সমাজের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, কারণ তাদের রয়েছে গভীর নলকূপ[২৩]।

[২২] এই মার্জিনে মার্কেট স্পেশালিস্টের খরচ অন্তর্ভুক্ত।
[২৩] উন্নয়ন অন্বেষণের গবেষণায় গ্রামের এই পরিস্থিতি উঠে এসেছে।

ফসল বোনার মৌসুম হলে এই সকল ব্যক্তিরা তাদের গভীর নলকূপ হতে তোলা পানি কৃষকদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। তাই ডিজেল ভর্তুকির প্রায় সবটাই চলে যাচ্ছে এই সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পকেটে। দরিদ্র কৃষক এর কোন সুফল পাচ্ছে না।

একই কথা প্রযোজ্য সারের বেলায়। অভিযোগ রয়েছে সরকার সারে যে ভর্তুকি দিচ্ছে তার অনেকাংশই চলে যাচ্ছে ডিলার এবং আমদানীকারকদের দখলে। তাই কৃষকদেরকে একদিকে সার কিনতে হচ্ছে তুলনামূলক উচ্চমূল্যে এবং অনেক সময়ই আবার উচ্চমূল্য দিয়েও সার পাওয়া যায় না। সার এবং ডিজেলের এই ভর্তুকি চোরাচালানকেও উৎসাহিত করে।

এই মডেলের শুরুতেই বলা হয়েছে প্রস্তাবিত মডেলের মাধ্যমে সারের ভর্তুকি কৃষকদের হাতেই পৌঁছে দেয়া হবে। তবে ডিজেলের ভর্তুকি একই রকমভাবে দেয়া সম্ভব নয়। তাই ডিজেলের ভর্তুকি তুলে দিয়ে একই পরিমাণ টাকা সরকার কৃষকদেরকে শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে নগদ দিয়ে দিতে পারে। এর ফলে কৃষক যে ভর্তুকি পায়না, এই ধরণের একটি ধারণার পরিবর্তন হবে। এই ধারণার একটি অন্যতম কারণ কৃষক কখনো এই ভর্তুকি চোখে দেখে না। তাই সে এই ধরণের কথাবার্তা বিশ্বাস করতে চায় না।

সম্প্রতি সরকার কৃষকদেরকে এইভাবে নগদ ভর্তুকি দেয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে তবে এতে পদ্ধতিগত এুটি রয়েছে বলে এই সহায়তার প্রকৃত সুফল কৃষকদের কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

তাই এই নগদ ভর্তুকি কিভাবে দেয়া হবে তা নিয়ে কৃষকদের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটি ফর্মুলা তৈরি করতে হবে। এই ভর্তুকি দেয়া যায় কৃষি জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। তবে এতে সমস্যা হল আমাদের দেশে সকল কৃষকের জমি নেই। তারা বর্গা কৃষক। তাই এই ব্যবস্থায় কৃষিকাজ করেও তারা কোন ভর্তুকি পাবে না।

এই সমস্যা কাটানো যায় যদি কৃষকের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভর্তুকি দেয়া হয়। অর্থাৎ, ***শস্য যার ভর্তুকি তার***। বর্গা চাষী যে পরিমাণ শস্যের মালিকানা পাবে, তারা সে অনুযায়ী ভর্তুকি পাবে। আর জমির মালিক যে পরিমাণ শস্যের ভাগ পাবে, তারা সে অনুযায়ী ভর্তুকি পাবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া যায়। সঙ্গে থাকতে পারে বাংলাদেশ রাইফেলস এর সদস্যরা কারণ অতি সম্প্রতি বাজার পর্যবেক্ষণের একটি দায়িত্ব তারা পেয়েছিলেন। তাই বাজার সম্পর্কে তাদের ভাল ধারণা রয়েছে। সেনাবাহিনী একই ধাচের ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পএ তৈরি করার একটি বৃহৎ প্রকল্প সম্প্রতি বাস্তবায়ন করেছে। তাই তাদের সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায় এই প্রস্তাবিত প্রকল্পে।

ব্যবস্থাপনা

এই শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু স্বায়ওশাসিতভাবে। এজন্য একটি আলাদা কোম্পানী গঠন করা যায়। এই কার্যক্রমটি সরকার শুরু করলেও ধীরে ধীরে প্রতিটি শস্য বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দিতে হবে। এর জন্য এনজিওদের সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে তাদেরকে এই কেন্দ্রগুলি চালানোর দায়িত্ব দেয়া যায়। তবে সেই ক্ষেত্রে সরকারকে বিটিআরসি'র মত একটি রেগুলেটরী বডি তৈরি করতে হবে যারা প্রত্যেকের মার্জিনের দিকে খেয়াল রাখবে এবং প্রয়োজনে তাতে পরিবর্তন আনবে।

মডেলটির নামকরণ

এই মডেলটি বাস্তবায়নের সকল পক্ষের সহযোগীতা প্রয়োজন। কৃষকদের অংশগ্রহণ যেমন এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়ার গুরত্বও অনেক। সেই সাথে মডেলটির বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা করার জন্য গবেষক, অর্থনীতিবিদ, আইটিবিদ, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের সকলের সহযোগীতা ছাড়া এই মডেলের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সেহেতু এই মডেলটির নাম দেয়া হল **বাংলাদেশ দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন মডেল।**

১০. মডেলটির পরীক্ষা

মডেলটি পরীক্ষার আগে সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ করে জেনে নিতে হবে সকলের মতামত। কারণ এই মডেল বাস্তবায়নে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। সবার আগে মতামত নিতে হবে কৃষকদের। কারণ মডেলটি যদি সফল হয়, তাহলে তা হবে তাদের কল্যাণেই। কারণ তারাই এই মডেলটির প্রাণ।

সেইসাথে কৃষি কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, স্থানীয় সাংবাদিক, সরকারী অফিসার, এনজিও অফিসার, সমাজবিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, আইটি এক্সপার্ট এবং স্থানীয় রাজনীতিবিদরদেরকে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করতে হবে।

মডেলটি পরীক্ষার জন্য উওরাঞ্চলের কয়েকটি পাশাপাশি ইউনিয়ন বাছাই করা যায় যেখানে ধানের ফলন ভাল হয়। প্রথমেই কৃষকদের এই মডেলের খুটিনাটি সম্পর্কে জানাতে হবে এবং এর সুফল তাদের কাছে বর্ণনা করতে হবে। কৃষকদের জাগরণ ছাড়া এই পরীক্ষা সফল হবে না।

এরপর কৃষকদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি তৈরি করতে হবে। তারপর শুরু করতে হবে শস্য বিক্রয় কেন্দ্র তৈরির কাজ। এর আয়তন কেমন হবে তা নির্ভর করবে এলাকার শস্য উৎপাদনের উপর। প্রথমে শুধু চাল দিয়েই পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা সফল হলে পরবর্তীতে একে একে অন্যান্য শস্যও যুক্ত করতে হবে।

চারটি ইউনিয়নে যদি আটটি কেন্দ্র বানানো যায়, তাহলে এগুলি হবে যোগান কেন্দ্র। এই সকল কেন্দ্র হতে শস্য পাঠানোর জন্য একটি চাহিদা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। এটি হতে পারে ঢাকার কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে।

সময়মতো মার্কেট স্পেশালিস্টদের লাইসেন্স দেয়া যেতে পারে। ফসল কাটার মৌসুম শুরু হলে কেন্দ্র খুলে দেয়া হবে এবং দেখা হবে এই পাইলট প্রকল্পে কোন সমস্যা আছে কি না।

এই পাইলট প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা যায় প্রায় ৫০-৬০ কোটি টাকা। এই প্রকল্প সফল হলে এ্কই ধাচের একের পর এক কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে দেশের বিভিন্ন জায়গায়।

এই পাইলট প্রকল্পের খরচের উপর ভিত্তি করে সরকার মোট খরচ বের করে ফেলতে পারবে। প্রকল্পটি সফল হলে এই সফলতা বিভিন্ন দাতা দেশ এবং সংস্থাগুলিকে দেখাতে হবে। ফলে তারা এই প্রকল্পে অর্থায়নে রাজি হতে পারে।

১১. প্রস্তাবিত মডেলটির সুফল

এই ধরণের একটি মডেল বাস্তবায়নের আগে হিসাব করতে হবে মডেলটির বাস্তবায়নে খরচ কতো হবে এবং এ থেকে সুফল কি কি পাওয়া যেতে পারে। সুফল যদি খরচের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নযোগ্য।

এই মডেলটির সুফল খুব অল্প কথায় শেষ করা অসম্ভব। কারণ এর প্রত্যক্ষ সুফল যেমন রয়েছে, তেমনি এর পরোক্ষ প্রভাবও ব্যাপক। নীচে এর কয়েকটি আলোচনা করা হলঃ

প্রত্যক্ষ প্রভাব

১. এই মডেলটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কৃষক তার পণ্যের দাম নিজেই ঠিক করতে পারবে। এর জন্য তাকে বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না।

২. তার লাভ-ক্ষতি বিবেচনায় কৃষক সবসময়ই তার পণ্যের দাম বাড়াতে পারবে, কমাতে পারবে। তাই উৎপাদন খরচ উঠে আসে না, এই ধরণের অভিযোগ কমে আসবে।

৩. কৃষির প্রতি কৃষকের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে, ফলে বাড়বে উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশ একটি নীট শস্য আমদানীকারক দেশ হলেও দেশের মোট শস্য চাহিদার তুলনায় আমদানী এখনো অনেক কম। তাই উৎপাদন বাড়লে দেশে শস্য উদ্বৃও হবে, এবং তা রপ্তানীও করা যাবে।

৪. কৃষকের জন্য দেয়া ভর্তুকি কৃষকের হাতে পৌঁছাবে। ফলে ভর্তুর্কির অপচয় কমে আসবে। সেই সাথে কৃষি উপকরণের চোরাচালান কমে আসবে।

৫. রপ্তানীকারকরা সরাসরি কৃষক সমিতির সাথে কণ্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ে যেতে পারবেন। এর জন্য তাদেরকে অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না। সরকারও শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রপ্তানীকারকদেরকে বিভিন্ন সুবিধা দিতে পারবে।

৬. সরকার কৃষিখাতের তথ্য সঠিক ভাবে পাবে। সেই সাথে বাজারের পরিস্থিতিও জানতে পারবে। ফলে নীতি কৌশলের কার্যকারিতা অনেকাংশেই বেড়ে যাবে।

৭. চাহিদা এবং যোগানের তথ্য জানা থাকলে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

৮. কৃষিতে আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে দারিদ্র্য বিমোচন হবে আরো অনেক দ্রুত গতিতে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে, তবে তা হচ্ছে মূলত পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে। কৃষক এখন প্রবাসী শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে, কৃষাণী হচ্ছে গার্মেন্টস কর্মী। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কৃষকদের পেশাকেই আকর্ষণীয় করা হবে।

৯. কৃষি পেশা আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে কৃষক তার উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করবে। ফলে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

১০. মার্কেট স্পেশালিস্ট পেশা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী একটি নতুন, সম্মানজনক পেশার উদ্ভব হবে যাতে তরুণ প্রজন্ম আগ্রহী হবে। ফলে প্রচুর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১১. মডেলটি সফল হলে একই ধাঁচের সব্জি, ফলমূল এবং মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা দেয়ার জন্য অনেক ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানী আগ্রহী হবে। ফলে সরকারকে তখন আর সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে না।

১২. বর্তমানে কৃষকদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যারা শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তারা কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। কিন্তু কৃষিখাত আকর্ষণীয় হলে এই নতুন প্রজন্ম কৃষিকাজকেই পেশা হিসাবে নিবে। ফলে এই শিক্ষিত কৃষকশ্রেণীর হাত ধরেই বাংলাদেশের কৃষিখাত প্রবেশ করবে নতুন যুগে।

১৩. বাংলাদেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি যা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। তাই এই বিপুল জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা

যদি দ্রুত বাড়িয়ে নেয়া যায়, তাহলে দেশের বাজার নির্ভর অনেক শিল্পের উদ্ভব হবে। ফলে রপ্তানীর উপর আমাদের অতিরিক্ত নির্ভরতাও অনেক কমে যাবে এবং বিশ্বায়নের বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

পরোক্ষ প্রভাব

১. কৃষির আয় বেড়ে যাওয়াতে প্রবাসে শ্রমিকদের দেন দরবার করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। ফলে তাদের উপর যে নির্যাতন চলে কিংবা তারা যে অতিরিক্ত কম মজুরী পাচ্ছে, সেই অবস্থার উন্নতি হবে। ফলে বিদেশী নিয়োগকর্তারা বেতন বাড়াতে বাধ্য হবেন। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি পাবে।

২. গার্মেন্টস কর্মীদের দেন দরবার করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে অনেক গুণ। ফলে গার্মেন্টস শিল্পে যে অন্যায়-অত্যাচার চলে, তা কমে আসবে। ফলে বাড়বে উৎপাদন।

৩. শস্য উদ্বৃও থাকলে সেই শস্য বিদেশে রপ্তানী করে ভাল আয় করা যাবে। এই উদ্বৃও শস্যের উপর ভিত্তি করে অনেক শিল্প মালিক এগ্রো প্রসেসিং শিল্পে বিনিয়োগ করবেন। ফলে কৃষি শিল্পে আসবে বিবর্তন।

৪. কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে দেশে সামগ্রিক সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাড়বে ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ।

৫. বর্তমানে অতিরিক্ত ঝুঁকির কারণে কৃষি খাতে ব্যক্তিমালিকানার ব্যাংকগুলি কোন ঋণ দিতে চায় না। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে কৃষি খাতে ঝুঁকি কমে আসবে, ফলে ব্যাংকাররা কৃষকদেরকে ঋণ দিতে আগ্রহী হবেন। ফলে কৃষকরা লাভবান হবে নতুন নতুন ব্যাংকিং সেবা থেকে।

৬. সমবায় সমিতিগুলো সফল হলে ভবিষ্যতে অনেক অসাধ্য কাজও সহজ হয়ে আসবে। ফলে কৃষকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে।

১২. মডেলটি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ

এই ধরণের একটি মডেল কি কি কারণে ব্যর্থ হতে পারে, সেগুলি যদি আমরা আগেই ধারণা করে এর বিপরীতে প্রস্তুতি মুলক ব্যবস্থা নিয়ে নিতে পারি, তাহলে মডেলটি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। এই ধরণের কিছু সম্ভাব্য কারণ নীচে দেয়া হলঃ

মডেলটি উচ্চাভিলাষী, বাস্তবতাবর্জিত এবং অত্যধিক ব্যয়বহুল। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এই জটিল, ব্যয়বহুল মডেল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ দরিদ্র বলেই এই মডেল বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ আমরা দ্রুত দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চাই।

এটি ব্যয়বহুল সন্দেহ নেই। তবে এই টাকা বাংলাদেশ পেতে পারে বিভিন্ন দাতা দেশ এবং সংস্থাগুলির কাছ থেকে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক এতে অর্থায়নে রাজি হতে পারে কারণ এই মডেলে সরকারের সবচেয়ে কম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাজার ব্যর্থতাকে কাটানো হয়েছে। সেই সাথে মুক্তবাজার অর্থনীতির সকল শর্তও নিশ্চিত করা হয়েছে।

দাতাগোষ্ঠীগুলি এগিয়ে না আসলে আমরা নিজেরাই এর অর্থায়ন করতে পারি। অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেয়া হলে যে অতিরিক্ত রাজস্ব আসবে, তা ব্যবহার করা যেতে পারে এই মডেল বাস্তবায়নে[২৪]। এই অর্থ আবার কমিশনের মাধ্যমে সরকার উঠিয়েও আনতে পারে খুব দ্রুততার সাথে।

সেই সাথে সরকার প্রতিটি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ব্যক্তিখাত থেকে অনুদান নিতে পারে। প্রতিটি এলাকাতেই এক বা একাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এই সকল কেন্দ্র নির্মাণে অনুদান দিতে আগ্রহী হবেন। তাদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রগুলির নামকরণ করা যেতে পারে সেই দানবীর ব্যক্তির নামে অথবা তার পরিবারের সদস্যদের নামে।

[২৪] আমাদের দেশে যে বিপুল পরিমাণ অপ্রদর্শিত আয় রয়েছে, এটা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন। এই বিপুল পরিমাণ অপ্রদর্শিত আয়কে কিভাবে দেশের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়, এই বিষয়ে লেখকের নিজস্ব একটি তত্ব রয়েছে। এই তত্ব জানতে চোখ রাখুন আইএফডি'র পরবর্তী ইমেইলগুলিতে।

এগিয়ে আসতে পারে বৃহৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলিও। সম্প্রতি আইডি কার্ড প্রকল্পে অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারকে ল্যাপটপ কম্পিউটার অনুদান হিসাবে দিয়েছে। একই রকমভাবে বিভিন্ন কোম্পানী থেকে সরকার বিভিন্ন রকম সুবিধা নিতে পারে।

সেই সাথে শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন থেকে সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারে যা সরকারের বিনিয়োগ দ্রুত উঠিয়ে আনতে সাহায্য করবে। যেহেতু শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে কৃষকরা নিয়মিত সমবেত হবে, সেহেতু দেশের বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রগুলিতে বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহী হবে।

আমাদেরকে এখানে মনে রাখতে হবে আমরা দীর্ঘদিনের একটি সিস্টেমের আমূল পরিবর্তন করতে চাচ্ছি। তাই এর জন্য প্রয়োজন অধিক বিনিয়োগ। আমরা আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগে দাতা সংস্থাগুলোর আপত্তি সত্বেও প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে যমুনা ব্রিজ তৈরি করতে পেরেছিলাম। এর জন্য আমাদেরকে দীর্ঘদিন সারচার্জও দিতে হয়েছে। তাই আজকে এর জন্য আরো বড় অথচ কার্যকরী একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে অসুবিধা থাকার কথা নয়।

সেই সাথে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে সে সকল যুক্তি তুলে ধরা যায় সেগুলি হলঃ

১. দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন শস্যের মূল্য ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। এটি শুধু বাংলাদেশের কাঠামোগত কারণেই ঘটবে না, এটি ঘটবে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণেও। কারণ বর্তমানে বায়ো ফুয়েল উৎপাদনের জন্য শস্যের বিভিন্নমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য কমে যাচ্ছে। সেই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে খাদ্য চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমরা আজকেই যদি একটি সিস্টেম গড়ে না তুলি তাহলে আগামীতে এই মূল্য বৃদ্ধির অধিকাংশ সুফল নিয়ে যাবে মধ্যস্বত্বভোগীরা। এর সুফল আমরা দারিদ্র্য বিমোচনে কাজে লাগাতে পারব না।

২. আগামীতে আমাদেরকে কৃষির উপর অধিক নজর দিতে হবে কারণ বিশ্বব্যাপী খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে তা খাদ্য নিরাপত্তাকে ব্যাহত করবে। তাই কৃষিকাজকে আকর্ষণীয় করতে না পারলে কৃষক কৃষি কাজ ছেড়ে দিবে যার প্রবণতা এখন দেখা যাচ্ছে।

৩. এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হবে ধাপে ধাপে। তাই এককালীন কোন বিরাট বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। এই প্রকল্পটির তৈরিতে মোট খরচ অনেক বেশি হলেও আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, মাএ এক থেকে দেড় কোটি টাকা ইউনিয়ন প্রতি বিনিয়োগে আমরা একই সাথে বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধান করছি, যেমন (১) কৃষকদের শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করছি, (২) সারের ব্যবস্থাপনার এুটি দুর করছি, (৩) সমবায় সমিতি গঠন করতে পারছি, এবং (৪) ভর্তুকি কৃষকদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি।

৪. ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশগুলির চাপে উন্নত দেশগুলি যদি তাদের কৃষিখাতে ভর্তুকি কমিয়ে দেয়, তাহলে সর্বএই শস্যের মূল্য বাড়বে। তাই এমন এক পরিস্থিতিতে বাজারে শস্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষক সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে বাজারের এই ব্যর্থতা কাটানোর বিকল্প কোন পথ নেই।

৫. বর্তমান গতিতে চললে ২০২১ সাল নাগাদ আমরা হয়তো একটি মধ্যআয়ের দেশ হতে পারব। তবে এই সময়ের মধ্যে স্বল্পন্নোত দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশকে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব নয়[২৫]। তাই নিজেদেরকে স্বল্পন্নোত দেশের তালিকা থেকে দ্রম্নত বের করে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন চিন্তাধারা।

[২৫] "মধ্যআয়ের দেশ" বা মিডল ইনকাম কান্ট্রি (Middle Income Country) এবং "স্বল্পন্নোত দেশ" বা লিস্ট ডেভলাপড কান্ট্রি (Least Developed Country), এই দুটি শব্দ নিয়ে খুব সম্ভবত জনমনে একটি বিভ্রান্তি রয়েছে। "স্বল্পন্নোত দেশ" শব্দটির প্রবক্তা জাতিসংঘ। একটি দেশ স্বল্পন্নোত কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য বেশ কয়েকটি সুচক রয়েছে। শুধুমাএ গড় মাথাপিছু আয়ের উপর ভিত্তি করে একটি দেশকে স্বল্পন্নোত দেশ বলা হয় না। যেমন, মালদিভস (Maldives) ২০১১ সাল নাগাদ স্বল্পন্নোত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণে সমর্থ হতে পারে, যদিও বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালে মালদিভসের মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় ৩২০০ ডলার, যা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে, "মধ্যআয়ের দেশ" শব্দটির প্রবক্তা বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি দেশ মধ্যআয়ের দেশ কিনা তা নির্ধারণের জন্য শুধুমাএ গড় মাথাপিছু আয়কেই বিবেচনা করা হয়। যেমন, কোন একটি দেশের মাথাপিছু আয় ৯৩৫ ডলার বা তার বেশি হলে তাকে মধ্যআয়ের দেশ বলা হবে। তাই বর্তমান গতিতে আগাতে থাকলে বাংলাদেশ হয়তো ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি মধ্যআয়ের দেশ হতে পারবে, কিন্তু জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বল্পন্নোত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে বাংলাদেশকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এখানে বলা দরকার, বিশ্বের বিভিন্ন ফোরামগুলিতে মুলত জাতিসংঘের সংজ্ঞাটিই বেশি ব্যবহৃত হয়।

মডেলটি ব্যর্থ হবে কারণ এর চেয়ে অনেক কম খরচে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (Commodity Exchange) গড়ে তোলা যায় যা মুলতঃ একই কাজ করবে।

যে কোন মডেল বাস্তবায়নের আগে দেখতে হবে মডেলটি বাস্তবায়নে যে পরিমাণ টাকা খরচ হবে, তার চেয়েও কম টাকায় অন্য কোন মডেল তৈরি করলে একই সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা।

প্রস্তাবিত এই মডেলটির বিপক্ষে এই যুক্তি অনেকেই দেখাতে পারেন যে, এর চেয়ে অনেক কম খরচে *কমোডিটি এক্সচেঞ্জ* তৈরি করে কৃষকদের শস্যের ন্যায্যমুল্য দেয়া সম্ভব।

আমাদের মতে, এটি সম্ভব নয়। কারণ,

প্রথমত, প্রস্তাবিত মডেলের মাধ্যমে শুধুমাএ স্পট লেনদেনের বা Spot Transaction এর প্রস্তাব করা হয়েছে। কোন ভবিষ্যত লেনদেন বা Forward Transaction এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে হবে না। অর্থাৎ ফসল ওঠার পরই এই কেন্দ্রগুলির কার্যক্রম শুরু হবে। তাই প্রস্তাবিত এই মডেলটি *কমোডিটি এক্সচেঞ্জের* সাথে পুরোপুরি তুলনীয় নয়।

দ্বিতীয়ত, একটি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে লেনদেন করতে হলে কৃষকদেরকে সেই লেনদেনের নিয়মকানুন বুঝতে হবে যা খুব একটা সহজ নয়। এর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন যা আমাদের কৃষকদের নেই। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই কমোডিটি এক্সচেঞ্জ নিয়ে খুব ভাল ধারণা রয়েছে, এই ধরণের দাবী নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ করলে এর মুল সুফল যাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে। কৃষকরা এর সুফল পাবে খুব কমই।

তৃতীয়ত, এই ধরণের কমোডিটি এক্সচেঞ্জে কমোডিটি ট্রেডারদের আধিপত্য থাকে। ফলে, বাজারের নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় পণ্য উৎপাদকের কাছে না থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চলে যায়। ফলে শুরু হয় ফটকাবাজারী বা Speculation। এই ধরণের কার্যক্রমের কারণে ভোক্তাকে পণ্যের জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত মুল্য দিতে হতে পারে।

এখানে বলা দরকার, আমাদের দেশে স্টক এক্সচেঞ্জ চালু রয়েছে আজ প্রায় ত্রিশ বছর হল। অথচ এখনো স্টক এক্সচেঞ্জের Efficiency বিশ্বমানের নয়। তাই একই ধাচের কমোডিটি এক্সচেঞ্জ গড়ে তুললে এর Efficiency বাড়াতে আমাদেরকে আরো অনেক সময় ব্যয় করতে হবে।

চতুর্থত, প্রস্তাবিত মডেলের মাধ্যমে একজন সাধারণ ভোক্তাও খুচরা শস্য কিনতে পারবে। কিন্তু একটি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে পণ্যের লেনদেন হয় মূলত পাইকারী আকারে। তাই সাধারণ ভোক্তা এর সুফল পাবে না।

পঞ্চমত, প্রস্তাবিত মডেলের মাধ্যমে শুধুমাত্র শস্যের ন্যায্যমূল্যই নিশ্চিত হবে না, বরং সার ব্যবস্থাপনা, সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষকদের কল্যাণ সাধনসহ আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ও এর সাথে যুক্ত থাকবে যা শুধুমাত্র কমোডিটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

এখানে বলা দরকার, কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রস্তাবিত মডেলের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক। প্রস্তাবিত মডেলটির সফল বাস্তবায়ন হলে কৃষকদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের নিজস্ব মজুদ করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে এমন একটা সময় আসবে যখন তাদের মধ্যেই কমোডিটি এক্সচেঞ্জ তৈরি করার চাহিদা সৃষ্টি হবে। সেই সময়ে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ তৈরি করলে কৃষকরা এর সুফল পাবে সবচেয়ে বেশি।

মডেলটি ব্যর্থ হবে যদি কৃষকরা এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শস্য বিক্রি করার প্রতি আগ্রহী না হয়।

এই সমস্যা সমাধানে প্রথমেই দেখতে হবে কৃষকরা কেন আগ্রহী না-ও হতে পারে। একটি কারণ হতে পারে সুবিধা বা Convenience। কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা সবসময় সনাতনী ব্যবস্থা হতে বেশি হতে হবে।

কেন্দ্রগুলি এমন জায়গায় স্থাপিত হতে হবে যাতে কৃষকরা সহজে তাদের পণ্য নিয়ে আসতে পারে এবং বিক্রি করতে পারে। নিয়ম কানুন হতে হবে সহজ। সেইসাথে কৃষকদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে ***স্যার*** বলে সম্বোধন করতে হবে। এটি করা হলে কৃষকের মনে এর প্রতিক্রিয়া হবে ব্যাপক।

কারণ কৃষকের সামাজিক মর্যাদা অনেক নীচে। তাই তাদেরকে মর্যাদা দিলে এই মডেলের প্রতি তাদের উৎসাহ অনেক বেড়ে যাবে।

আরেকটি কারণ হতে পারে, বর্তমান ব্যবস্থায় কৃষক খুব তাড়াতাড়ি টাকা হাতে পেয়ে যায়। এটি দরিদ্র কৃষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র কৃষকদের জন্য তাড়াতাড়ি টাকা হাতে পাওয়ার সুবিধা সফটওয়্যারে প্রস্তাব করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সমিতির দরিদ্র সদস্যদেরকে সবার আগে শস্য বিক্রি করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

মডেলটি ব্যর্থ হবে যদি সমবায় সমিতিগুলো সফলভাবে কাজ না করে। বাংলাদেশে সফল সমবায় সমিতির উদাহরণ খুব বেশি নয়।

"বাঙ্গালী একাই একশ হতে পারে, কিন্তু একশ বাঙ্গালী কখনো এক হতে পারে না[২৬]।"

এটি একটি ধ্রুব সত্য। বাঙ্গালীকে এক করার ফর্মুলা হল তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি কমন বিপদে ফেলে দেয়া অথবা তাদের সকলের উপর একটি কমন চাপ প্রয়োগ করা। যেহেতু বর্তমান অবস্থায় কৃষকদেরকে একসাথে বিপদে ফেলার কোন প্রকার সুযোগ নেই, তাই তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কৃষকদেরকে বলে দেয়া যেতে পারে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে শস্য বিক্রি না করলে এবং সমিতির সদস্য না হলে ভবিষ্যতে কোন সার বা ভর্তুকি পাওয়া যাবে না। এতে কৃষকরা বাধ্য হয়ে এই সমবায় সমিতির আওতায় আসবে।

সেইসাথে সমবায় সমিতিগুলো কেন ব্যর্থ হয় তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হল ব্যক্তিগত বিরোধ যা আমরা কাশেম মিঞার গল্পে দেখেছি। এই সকল বিরোধের কারণে মানুষ এক হতে পারে না। সেইসাথে রাজনীতিকরণ, গোষ্ঠীস্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দান, দুর্নীতি প্রভৃতিও সমবায় সমিতি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ।

সমিতি সফল করার একটি উপায় হল প্রথম পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত সহজ সিদ্ধান্তগুলি সম্মিলিতভাবে নেয়া। সমিতি সফল হয়ে গেলে এবং টিমওয়ার্ক গড়ে উঠলে ধীরে ধীরে জটিল সিদ্ধান্তগুলি সম্মিলিতভাবে নিতে হবে।

[২৬] এই তত্বটির প্রবক্তা জনপ্রিয় উপস্থাপক হানিফ সংকেত। তিনি এই তত্বটি প্রথম প্রকাশ করেন তার একটি ক্যাসেটে আজ থেকে অনেক বছর আগে।

এই কারণগুলি অনুসন্ধানে সমবায় সমিতি যারা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। সেই সাথে এই বিষয়ের উপর যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তাদেরকে প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করতে হবে।

তবে একটি কথা খেয়াল রাখতে হবে সমবায় সমিতি গঠন এই মডেলটির সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত নয়। সমবায় সমিতি করা হবে কৃষকদের কল্যাণ বৃদ্ধির স্বার্থে। সমবায় সমিতি ব্যর্থ হলে কৃষকরা ব্যক্তিপর্যায়েই তাদের শস্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। ফলে সমিতি করে যে সকল সিদ্ধান্ত নিতে হতো, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকেই।

মডেলটি ব্যর্থ হবে কারণ একটি শস্যের (যেমন চাল) অনেক ধরণ রয়েছে। তাই প্রতিটি ধরণের বিক্রির ব্যবস্থা করা জটিল হবে। ফলে আস্থার সঙ্কট দেখা দিবে।

এটি এই মডেল বাস্তবায়নের একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। প্রতি ধরণ চালের আবার বিভিন্ন মান বা গ্রেড রয়েছে। তাই একটি অঞ্চলের কৃষকরা যদি অন্তত বিশ রকমের চাল আনতে থাকে, তাহলে এই বিশ রকমের চাল বিক্রয়ে সমস্যা দেখা দিবে।

সনাতনী ব্যবস্থায় এই গ্রেডগুলো আলাদা করে চাতাল মালিকরা বা আড়তদাররা। তাই ভোক্তা বিভিন্ন দামে একই চালের বিভিন্ন গ্রেড ক্রয় করে। চালে গ্রেডের তফাত বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন, পরিচর্যার ভিন্নতা, ধানের ধরণে তফাত, ধান ভাঙ্গাতে বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ, ইত্যাদি।

এই সমস্যা কাটানোর জন্য সমবায় সমিতি থেকে কৃষকদেরকে বলে দেয়া যেতে পারে এবার কৃষকদেরকে কোন ধান বুনতে হবে এবং এর চাল কোন গ্রেডের হতে হবে। যেমন সমিতিতে কৃষকরা সকলে মিলে ঠিক করল তারা এবার শুধু মিনিকেট এবং নাজিরশাইলের সবচেয়ে উন্নত গ্রেড উৎপাদন করবে। এই গ্রেডের নাম দেয়া যেতে পারে, মিনিকেট-১ এবং নাজিরশাইল-১।

এখন বাস্তবে দেখা দেখা গেল অনেক কৃষকের চাল কিছুটা খারাপ হয়েছে আবার কিছু কৃষকের চাল একেবারেই খারাপ। তাই বিক্রির সময় সিস্টেমে ঢোকানো হবে ছয় ধরণের চালের গ্রেড; মিনিকেট-১,২ এবং ৩ এবং নাজিরশাইল-১,২ এবং ৩।

কোন চাল কোন গ্রেডে পড়েছে তা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি কাজ করবে। এই কমিটিতে থাকবেন সমিতির সদস্যরা এবং মার্কেট স্পেশালিস্টের প্রতিনিধি। কোন চাল কোন গ্রেডে পড়েছে, তার সার্টিফিকেট এই কমিটি দিবে।

এরপর সেই গ্রেডের নাম বস্তার উপর লিখে তা জমা করা হবে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট স্থানে। সেইসাথে প্রতি বস্তার ওজনও মেপে নেয়া হবে। কৃষকদেরকে আগেভাগেই বলে দেয়া হবে একটি চালসহ বস্তার ওজন কতো হতে হবে। ফলে সকল কৃষকের বস্তাতেই একই ওজনের চাল থাকবে। একই উপায়ে প্রতিটি শস্যকেই Standardized করা হবে।

মডেলটিতে মার্কেট স্পেশালিস্টদের অনেক ক্ষমতা দিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তারা এক জোট হয়ে দাম বাড়িয়ে দেবে। ফলে এই সিস্টেমের প্রতি ভোক্তার আস্থা কমে যাবে।

এই মডেলে মার্কেট স্পেশালিস্টদের অনেক ক্ষমতা এটা ঠিক, তবে প্রতিটি কেন্দ্রের আওতায় প্রচুর সংখ্যত মার্কেট স্পেশালিস্টকে লাইসেন্স দেয়া হবে। এতে কোন সরকারি কোটা থাকবে না। ফলে এই পেশা হবে সবার জন্য উন্মুক্ত। যেমন, গ্রামীণ কৃষক, ফড়িয়া, বেপারী কিংবা চালকল মালিকরাও যেমন মার্কেট স্পেশালিস্ট হতে পারবেন তেমনি শহুরে শিক্ষিত তরুণরা যারা আগে কখনো কৃষি পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন না, তারাও এই পেশায় যুক্ত হতে পারবেন। ফলে মডেলটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে মার্কেট স্পেশালিস্টদের মধ্যেই প্রচন্ড প্রতিযোগীতা থাকবে।

এরপরও যদি তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায় এবং লাভ বৃদ্ধি করার প্রবণতা দেখা যায়, তাহলে সরকার তাদের একটি নির্দিষ্ট লাভ বেধে দিতে পারে। এর অন্যথা হলে সরকার মার্কেট স্পেশালিস্টদের লাইসেন্স বাতিল করবে।

মডেলটিতে মার্কেট স্পেশালিস্টরা যোগান কেন্দ্র থেকে শস্য কিনে তা তারা তাদের নিজের গুদামে মজুদ করে রাখতে পারে। ফলে চাতাল মালিকদের হাত হতে মজুদদারী চলে যাবে মার্কেট স্পেশালিস্টদের হাতে।

এই সমস্যা কাটানো যায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে। নিয়ম করা যায় একজন মার্কেট স্পেশালিস্ট কোন যোগান কেন্দ্র হতে শস্য কিনলে তা অন্তত ৩ দিনের মধ্যে অন্য কোন চাহিদা কেন্দ্রে তা জমা করতে হবে। না হলে তাদের উপর জরিমানা করা হবে। এই ব্যবস্থা সফটওয়্যারের মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায়।

মডেলটিতে বাস্তবায়নের সময় সনাতনী চাতাল মালিকরা এবং আড়তদাররা প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ফলে চালের বাজার হতে পারে অস্থির। সেই সাথে তারা কৃষকদেরকে বেশি দাম দিয়ে প্রলোভন দেখাতে পারে।

চাতাল মালিক, ফড়িয়া, আড়তদার এবং অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া কমানো যায় যদি তাদেরকেও এই ব্যবস্থার সুফল দেয়া যায়। মার্কেট স্পেশালিস্ট হওয়ার সুযোগ যেহেতু তাদেরকেও দেয়া হবে সেহেতু লাভ নিশ্চিত থাকাতে আশা করা যায় তারা এই ব্যবস্থায়ও সহযোগীতা করবে।

মডেলটি ব্যর্থ হবে যদি ভোক্তা সাড়া না দেয়।

ভোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য পরীক্ষামূলক পর্যায়ে এমন মূল্য ঠিক করতে হবে যা অন্যান্য স্থানের চেয়ে কম। তাই খুচরা মূল্য আগে নির্ধারণ করে পরে কৃষকের মূল্য ঠিক করতে হবে। খুচরা মূল্য ঠিক করতে কাওরানবাজারের মূল্যকে ভিত্তি হিসাবে ধরা যায়। কৃষকদেরকে বোঝাতে হবে এই ব্যবস্থার পুরো সুফল পাওয়া যাবে যখন সারা দেশব্যাপী এই ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তাই প্রাথমিকভাবে কিছুটা কম মূল্য ধার্য করাই যুক্তিযুক্ত।

সেই সাথে কেন্দ্রগুলি এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখানে সহজে যাওয়া যায়। অতিরিক্ত ট্রাকের কারণে যাতে যানজট না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

মডেলটি পুরাপুরি বাস্তবায়িত হলে কৃষকদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে যার অপব্যবহার তারা করবে।

কৃষকদের ক্ষমতা বাড়ানো এই মডেলটির মূল লক্ষ্য। তবে তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সরকার কৃষক সমিতিগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে মূল্য কমাতে পারবে।

এখানে বলা দরকার, কৃষকদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ এই মডেলে আসলে খুবই কম। কারণ কৃষক ন্যায্য মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য ঠিক করলে তা চাহিদাতে প্রভাব ফেলবে। ফলে চাহিদা কমে যাবে, এবং এর কারণে কৃষকরাও মূল্য কমাতে বাধ্য হবে। তাই এই পুরো প্রক্রিয়াটি চলবে বাজারের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনেই।

তবে যে বছর বন্যার বা খরার কারণে ফসলহানি হবে, সেই বছর স্বভাবতই কৃষক চাইবে তার পরবর্তী ফসলের মূল্য এমন হোক যাতে তার ক্ষতি পুষিয়ে যায়। তাই সেই বছর হয়তো কৃষক সমিতিগুলো এমন নিম্নতম মূল্য ধার্য করবে যা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশ বেশি হবে। তাই ভোক্তাকেও অধিক মূল্যে শস্য কিনতে হবে।

এর ফলে ভোক্তার খরচ বাড়লেও সরকারের উচিত হবে না এই মূল্যকে প্রভাবিত করার। কারণ এর ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরই উন্নয়ন হবে।

মডেলটি পুরাপুরি বাস্তবায়িত হলে কৃষকদের হাতে টাকা আসবে অনেক ধীরে। কারণ তখন কেন্দ্রগুলিই হবে মুল বাজার। বর্তমান ব্যবস্থায় চাতাল মালিকরা একসাথে সকল পণ্য কিনে নেয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় চাতাল মালিকরা আর চাল কিনে স্টক করবে না কারণ তাদের এতে কোন লাভ থাকবে না।

হ্যা। তবে এখানে বলা দরকার মডেলটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। তাই আশা করা যায় এই সময়ের মধ্যে কৃষকদের আর্থিক অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হবে। তাই তাদের হাতে টাকা ধীরে আসার যে সমস্যা, তা আর তখন সমস্যা থাকবে না।

যোগান কেন্দ্রগুলিতে যেহেতু চাতাল মালিকদেরও সুযোগ থাকবে, তাই একজন বৃহৎ চাতাল মালিক এসে সবার আগে বিরাট অংশ কিনে নিয়ে যেতে পারে। ফলে বাজারের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকবে।

এই সমস্যা কাটানো যায় যদি কেন্দ্রে চাল জমা হওয়ার পর শুধুমাএ মার্কেট স্পেশালিস্টদেরকে সবার আগে চাল কেনার সুযোগ দেয়া হয়। তাই মার্কেট স্পেশালিস্টরা তাদের লাইসেন্স দেখিয়ে শস্য কিনবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা চাহিদা কেন্দ্রে পৌঁছে দিবে। এরপর কাউন্টারগুলি থেকে শস্য কিনতে কোন লাইসেন্স দেখাতে হবে না। ফলে মার্কেট স্পেশালিস্টদের মধ্যে যারা স্থানীয় চাতাল মালিক কিংবা মজুদদার রয়েছে, তারা তখন শস্য কিনে তাদের গুদামে মজুদ করতে পারবে।

মার্কেট স্পেশালিস্টরা কখনো চাইবে না যে তাদের শস্য খুচরা সেকশনে বিক্রি হোক। কারণ এতে তাদের বিক্রি হবে ধীর গতিতে। ফলে টাকা আসবে ধীরে ধীরে।

এই সমস্যা কাটানো যায় যদি খুচরা বিক্রয়টিকে সকলের উপর আনুপাতিক হারে বিভক্ত করা যায়। ধরা যাক, কোন কেন্দ্রে চাল আছে ৫০০০ কেজি। এই চাল আবার নিয়ে এসেছে ২০ জন মার্কেট স্পেশালিস্ট।

চাহিদা দেখে মহাব্যবস্থাপক ঠিক করলেন এর ৩০০ কেজি তিনি খুচরা সেকশনে দিয়ে দিবেন। এখন আনুপাতিক হারে বিভক্ত করার ফর্মুলা হলঃ

ধরা যাক, একজন মার্কেট স্পেশালিস্ট এনেছেন ১০০০ কেজি। এখন ৩০০ কেজি ৫০০০ কেজির ৬%। তাহলে খুচরা বিক্রয়ে তার অংশ হবে ৬% বা ৬০ কেজি। তার ১০০০ কেজির মধ্যে ৯৪০ কেজি বিক্রি ধরা হবে পাইকারী সেকশনে এবং বাকি বিক্রি ধরা হবে খুচরা সেকশনে।

চাহিদা কেন্দ্রগুলি থেকে শস্য আড়তদাররা কিনে নিলে তারা মজুদ করা শুরু করবে। ফলে বাজারে মুল্য বৃদ্ধির যে প্রবণতা তা কমবে না।

না। এটি ঘটবে না। কারণ শহুরে আড়তদারদের মজুদ করার ক্ষমতা এতোটা নেই। জমির মুল্য বৃদ্ধির কারণে এই ক্ষমতা ভবিষ্যতে বাড়ারও সুযোগ কম। সেই সাথে খুচরা বিক্রির সুযোগ থাকায় কেন্দ্রগুলি কাজ করবে মার্কেট স্ট্যাবিলাইজার হিসাবে। এটি ঘটবে যখন বাজার পুরোপুরিই চলে আসবে শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলির হাতে।

তবে এর পরও যদি বাজারে মুল্য বৃদ্ধির সুযোগ থাকে, তাহলে সরকার সময়মতো আমদানী করার সুযোগ দিবে। সরকার আমদানী করবে তখনই যখন দেখবে শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে মজুদ কমে আসছে। আমদানীকারকদেরকে তখন শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই খুচরা বিক্রি করতে হবে। ফলে বাজারে মুল্য বৃদ্ধির প্রবণতা কমে আসবে।

এই মডেলটি বাস্তবায়িত হতে থাকলে এক শ্রেণীর ভূমি দস্যুর উদ্ভব হবে যারা কৃষকদের জমি কেড়ে নিতে থাকবে কারণ তখন কৃষি জমির দাম বেড়ে যাবে অনেক। ফলে শুরুতেই এই মডেলটি বিতর্কিত হয়ে যাবে।

হ্যা। এই ধরণের একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মডেলটি বাস্তবায়িত হতে থাকলে এক শ্রেণীর কোটিপতি ব্যবসায়ী কৃষকদের দারিদ্র্যতাকে পুঁজি করে প্রচুর কৃষি জমি কিনতে থাকবে। তাদের একটি দল পরিণত হবে ভূমি দস্যুতে যারা দরিদ্রদের কৃষিজমি অন্যায়ভাবে দখল করে নিতে থাকবে। ফলে সমাজে দরিদ্রদের সংখ্যা না কমে বরং আরো বেড়ে যেতে পারে।

এই মডেলটি সমাজের বিওবানদের কৃষিখাতে আগ্রহী করে তুলবে এটা ঠিক এবং এতে দোষের কিছু নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমির লেনদেনে কোন প্রকার যেন অন্যায়ের আশ্রয় নেয়া না হয়, ভয়ভীতি দেখানো না হয়, এবং কৃষক যেন তার জমি বাজার মুল্যে বিক্রি করতে পারে।

এই মডেলের কারণে সমাজে যাতে শোষণ আরো বেড়ে না যায় সেজন্য সরকারসহ সমাজের নের্তৃস্থানীয় এবং সচেতন সকল নাগরিককেই এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সমাজের বঞ্চিতদের অধিকার

যাতে নিশ্চিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে মিডিয়ার সচেতনতা খুবই প্রয়োজন।

এই মডেল ব্যর্থ হবে যদি রাজনৈতিক দলগুলো একে অতিরিক্ত রাজনৈতিক বেড়াজালে বন্দী করে ফেলে।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের ভোট পাওয়ার একটি লোভনীয় সুযোগ এই মডেলে রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দলগুলি চাইবে এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করতে। ফলে এতে ঢুকে যাবে রাজনীতি। কৃষকদের কল্যাণ তখন আর মুখ্য থাকবে না।

এর জন্য রাজনৈতিক নের্তৃত্বের সদিচ্ছা থাকতে হবে। তাদেরকেই বুঝতে হবে দেশের স্বার্থ। তা না হলে এই মডেল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মডেলটি ব্যর্থ হওয়ার আরো অনেক কারণ থাকতে পারে যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

হ্যা। এটা হতে পারে। তবে জেনেশুনে এই মডেলটি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাব্য কোন কারণ এই পেপারে গোপন করা হয়নি। এই ব্যাপারে পাঠকরা শতভাগ নিশ্চিত থাকতে পারেন।

তবে এই মডেলটি যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয় এবং কিছুদিন পর যদি দেখা যায় এই মডেলটি এমন একটি কারণে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে যা আগে বোঝা যায়নি, তাহলে অবশ্য খুব বেশি হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

কারণ এই শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলিকে তখন অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই রকম কিছু কাজ নীচে উল্লেখ করা হলঃ

১. এই কেন্দ্রগুলিকে আরো কিছু টাকা খরচ করে কমিউনিটি সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। ফলে উপকৃত হবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। আশা করা যায়, সেই সময়ের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক এবং একই রকম আরো অনেক ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণে এমনিতেই গ্রামের মানুষ অনেক ধনী হয়ে যাবে। তাই সেই সকল গ্রামীণ দারিদ্র্যমুক্ত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সামাজিক

অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, বার্থডে পার্টি,ভালবাসা দিবসের অনুষ্ঠান, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে পারে এই সকল নতুন কমিউনিটি সেন্টারগুলিতে। ফলে সরকারও যেমন রাজস্ব পাবে, তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

২. এই কেন্দ্রগুলিকে খালি না রেখে এগুলিকে গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে তুলে দিতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংক তখন এই কেন্দ্রগুলিকে সিনেমা থিয়েটার বানিয়ে তাদের দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদেরকে সিনেমা দেখাবে।

৩. এই সেন্টারগুলিকে আরো আধুনিকায়ন করে কম্পিউটার সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্য থেকে। তারা ইমেইল করবে, ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করবে, বিদেশ থেকে টাকা রিসিভ করবে। ফলে চঞ্চল হবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবন। এর প্রভাব পড়বে শহর এলাকাগুলিতেও। শহরমুখী মানুষের স্রোত কমে আসবে। বরং গ্রামীণ এলাকায় শহরের মানুষ স্থানান্তর শুরু হবে। বর্তমানে সকলেরই দৃষ্টি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের প্রতি। কিন্তু শহরের দরিদ্রদের প্রতি কারো খেয়াল নেই। তাই এই সকল শহুরে দরিদ্র মানুষ ভিড় জমাবে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে।

১৩. মডেলটির সীমাবদ্ধতা

এই মডেলটির সীমাবদ্ধতা হল যে এই মডেল বাস্তবায়িত করতে হবে সরকারকেই। ব্যক্তিখাত এই মডেল বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে না, আর আসলেও তা কৃষকদের জন্য কল্যাণকর হবে না।

আরও একটি সীমাবদ্ধতা হল এই ধরণের আর কোন মডেল সম্ভবত অন্য কোন দেশে নেই। জাপানে এই মডেলের কাছাকাছি একটি মডেল রয়েছে, তবে সেই মডেল আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত নয় কারণ প্রথমত, আমাদের কৃষকরা খুবই দরিদ্র, দ্বিতীয়ত, আমাদের জনসংখ্যা ঘনত্ব অনেক বেশি, এবং তৃতীয়ত, আমাদের কৃষকরা শিক্ষিত নয়।

তবে এই মডেল যদি সফল হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য দরিদ্র অথচ কৃষিপ্রধান দেশ যে এই মডেল তৈরিতে বাংলাদেশকে অনুসরণ করবে, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

তবে এই মডেলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা অন্যএ।

এই মডেল তৈরীতে যে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন তত্ত্বের ব্যবহার করা হয়েছে তা দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে রচিত। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সংজ্ঞামতে দারিদ্র্য একটি অর্থনৈতিক সমস্যা, তাই এর সমাধানও করতে হবে অর্থনৈতিকভাবে।

কিন্তু আমরা কাশেম মিঞার গল্পে দেখেছি সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিকতা, মানুষের স্বভাব ইত্যাদিও দারিদ্র্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা গেলে মানুষের স্বভাব এবং নৈতিকতাতেও পরিবর্তন আসবে। তাই অন্যান্য যে সকল সমস্যাগুলোর কথা বলা হয়েছে, তা আপনাআপনিই দুর হয়ে যাবে।

তত্ত্বের এই ধরণের একটি এপ্রোচের মুল কারণ বাংলায় প্রচলিত একটি বাগধারা। বাগধারাটি হল **“অভাবে স্বভাব নষ্ট”**। এখানে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, স্বভাব

খারাপ হওয়ার মূল কারণ আর্থিক দারিদ্র্য। তাহলে ধরে নেয়া যায়, আর্থিক দারিদ্র্য দুর করা গেলে মানুষের স্বভাবও ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কথা হল, এই ধরণের ধারণা সঠিক কিনা।

না। সঠিক নয়।

এটা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন, আমাদের চারপাশে যাদের স্বভাব সবচেয়ে বেশী নষ্ট, তাদের আসলে কোন অভাব নেই।

তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

সমস্যাটি হল নৈতিকতায়।

অভাব দুর হলেই মানুষের নৈতিকতাও যে উন্নত হবে তার আসলে কোন গ্যারান্টি নেই। বরং অতিরিক্ত টাকা এবং আধুনিক জীবন যাএার মান মানুষের নৈতিকতাকে আরো ভেঙ্গে দিতে পারে। অভাব মোচন এবং নৈতিকতা বৃদ্ধির সাথে পারস্পরিক এই সম্পর্ক দুর্বল থাকার কারণে প্রচলিত ধ্যানধারণা অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন করতে গেলে আমরা হয়তো কাগজে কলমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারব, কিন্তু এর সাথে নৈতিকতার যুগপত উন্নয়ন না ঘটালে ভবিষ্যতে তৈরী হবে নিত্যনতুন সমস্যা যা আমাদের সামগ্রিক আর্থিক দারিদ্র্যকে দীর্ঘমেয়াদে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

মানুষের নৈতিকতা যদি বৃদ্ধি করা না যায় তাহলে টেকশই উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধি করা না গেলে আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি বাড়বে দুর্নীতি যা আবার উন্নয়নের গতিকেই দীর্ঘমেয়াদে কমিয়ে দেবে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিশ্ব উন্নয়ন এজেন্ডায় কখনোই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

যেমন জাতিসংঘ প্রণীত যে সকল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাএা বা Millennium Development Goal ঠিক করা হয়েছে, তাতে আর্থিক দারিদ্র্য, শিক্ষা, নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিশুস্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু, এইডসের বিস্তার, পরিবেশ রক্ষা, এবং সহযোগীতার মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এই লক্ষ্যমাএাতে ২০১৫ সাল নাগাদ মানুষের সামগ্রিক নৈতিকতা বৃদ্ধির কোন লক্ষ্যমাএা ঠিক করা হয়নি। ফলে বিশ্ব

উন্নয়ন এজেন্ডায় এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যে উপেক্ষিত, এতে নিশ্চয়ই কারোরই দ্বিমত থাকার কথা নয়।

আর্থিক দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি সামগ্রিক জাতীয় নৈতিকতাকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হতে পারে। তবে আমাদের মতে, ধর্মীয় বাণীর সুষ্ঠু প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় নৈতিকতায় দ্রুত উন্নয়ন আনা সম্ভব। বিশেষ করে, মহান আলাহপাক আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের সবকিছুর হিসাব রাখছেন, এবং সর্বশেষে তার কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সকল হিসাব দেয়ার জন্য, এই বিশ্বাস কম বেশি সকলের মনে জাগ্রত করতে পারলে আমাদের নৈতিকতার দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে। আমাদের মতে, এটাই সর্বোৎকৃষ্ট জবাবদিহিতা। এটি শুধু ইসলাম ধর্মের মূল বাণী নয়, বরং বিশ্বের অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলোরও মূল কথা এটাই।

তাহলে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, বিশ্বব্যাপী প্রচলিত দারিদ্র্যের সংজ্ঞাতে কি তাহলে গলদ আছে?

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেব না।

আমাদের সবাইকেই এর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে অঢেল টাকার মালিক, উচ্চশিক্ষিত, সুস্থাস্থ্যের অধিকারী, এবং এইডসের বিস্তার রোধে সবসময় সচেতন অথচ নৈতিকভাবে চরম দেউলিয়া, এমন কোন ব্যক্তিকে আমরা আসলেই ধনী বলব কিনা।

১৪. শেষ কথা

খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা যদি মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে, ঋণ পাওয়া যদি মানুষের অধিকার হয়, তাহলে পণ্য উৎপাদন করে তার মুল্য নিজে ঠিক করাও মানুষের একটি অধিকার।

আশ্চর্যজনকভাবে, দেশের অধিকাংশ উৎপাদক এই অধিকার পেলেও দেশের কৃষককে কখনো এই অধিকার দেয়া হয়নি। এমনকি কৃষক যে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই কথাটিও কেউ জোর গলায় বলেন না। অথচ এই কৃষকই নাকি দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড।

এই মডেলটি যদি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে আশা করা যায় কৃষকদের মধ্যে তা ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করবে। কারণ নিজের শস্যের মুল্য নিজেই নির্ধারণের সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি কৃষক ভর্তুকির টাকা নিজের চোখে দেখবে। কৃষক বুঝবে সরকার তার জন্য কিছু না কিছু করছে। তাই সে একা নয়।

এই ভর্তুকি প্রদানের দিনটি নবান্নের মতোই হবে গ্রামীণ একটি উৎসবের দিন। সেই উৎসব দিনের উদ্বোধন করবেন আমাদের রাজনীতিবিদরা। ব্র্যান্ড নিউ পাজেরো জীপে চড়ে আমাদের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরা যাবেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে। তুমুল হর্ষধ্বনি এবং করতালির মধ্যে সমিতির প্রেসিডেন্টের হাতে তারা তুলে দিবেন ভর্তুকির প্ল্যাকার্ড, ঠিক যেমনটি ক্রিকেটে ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার দেয়া হয়।

এই ভর্তুকির টাকা, নিজের শ্রম, এবং মেধাকে কাজে লাগিয়ে কৃষক তখন মাঠে সোনা ফলাবে। সেই সোনাশস্য কৃষক শস্য বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসবে বিক্রয় করার জন্য। ধীরে ধীরে তাদের এই শস্য কৃষকরা সমিতিগুলোর মাধ্যমে নিজেরাই নিয়ে যাবে যোগান কেন্দ্র থেকে চাহিদা কেন্দ্রগুলিতে। এর জন্য সমিতিগুলো কিনবে ছয় চাকার পাঁচটনি ট্রাক।

ধীরে ধীরে এই পাঁচটনি ট্রাক পরিণত হবে ষোল চাকার চল্লিশ টনের ঝকঝকে লরিতে।

আমরা যখন রেডিওর গানের তালে তালে আট লেনের এক্সপ্রেস ওয়েতে দ্রুত বেগে গাড়ি চালাতে থাকব, তখন শা শা করে লরিগুলো আমাদেরকে ক্রস করবে।

আমরা তাকিয়ে দেখব লরিগুলোতে কৃষাণীর হাস্যজ্জ্বল ছবি, সঙ্গে কোন এক কৃষক সমিতির লোগো।

সেই লোগো দেখে আমরা বুঝব লরিটি এসেছে উওরাঞ্চলের কোন কৃষিপ্রধান অঞ্চল থেকে। আমরা বুঝব এই লরিটির মালিক কোন বিলিয়নেয়ার শিল্পপতি নন। এর মালিক আমাদের কৃষকরাই।

সংযুক্তি – ১

দ্রব্যমূল্য কিভাবে বাড়ে,কমে?

খুচরা পর্যায়ে দ্রব্যমূল্য বাড়া এবং কমার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নীচের বিষয়গুলি কাজ করেঃ

১. দ্রব্যের চাহিদা
২. দ্রব্যের সরবরাহ

উপরের দুটি ফ্যাক্টর আবার প্রভাবিত হয় আরও অন্যান্য ফ্যাক্টরের মাধ্যমে। এর মধ্যে প্রধান দুটি ফ্যাক্টর হলঃ

১. খুচরা পর্যায়ে দ্রব্যের স্টক
২. ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা

দ্রব্যের চাহিদা যদি দ্রব্যের সরবরাহের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে দ্রব্যের মূল্য বাড়বে। আবার চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের সরবরাহ বেশি হলে মূল্য কমবে। আমাদের দেশে বাজারের সকল পণ্যই এই নিয়ম মেনে চলে।

খুচরা পর্যায়ে দ্রব্যের স্টক এবং ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা একে অপরের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা বোঝানোর জন্য নীচের বক্সে একটি সহজ উদাহরণ দেয়া হলঃ

সেলিম মিঞার শশা-র ব্যবসা

সেলিম মিঞা ঢাকার একটি বাজারে শশা বিক্রি করেন। শশা পচনশীল দ্রব্য বলে তিনি প্রতিদিনের শশা প্রতিদিন কাওরানবাজার থেকে কিনে আনেন। তিনি তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখছেন, প্রতিদিন তিনি যদি ২৫-৩০ কেজি শশা পাইকারী দামে কিনে আনেন, তাহলে দিনশেষে তার প্রায় সব শশাই বিক্রি হয়ে যায়। তিন বছর আগে তিনি কিনে আনতেন ১৫-২০ কেজি শশা। তবে বিগত দুই বছরে বাজারে শশার চাহিদা বেড়েছে। তাই তিনি দেখেছেন, ৩০ কেজি আনলেও দিন শেষে তিনি সব শশা বিক্রি করে ফেলতে পারছেন। তাই তিনি তার প্রতিদিনের বিনিয়োগ আগের তুলনায় বাড়িয়েছেন।

সেলিম মিঞার মতো বাজারের আরো অনেক সব্জি বিক্রেতাও কাওরান বাজার থেকেই শশা কিনে আনে। তাই কাওরান বাজারের যে বাজার মূল্য থাকে, সেই বাজার মূল্যেই সকলকেই শশা কিনতে হয়।

বাজার যখন শুরু হয়, তখন সেলিম মিঞা তার ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে একটি দাম ঠিক করেন। অন্যান্য সব্জি বিক্রেতাও প্রায় একই দাম ঠিক করে, কারণ সকলের শশা-ই কাওরান বাজার থেকেই কেনা। এর সাথে পরিবহন খরচ যোগ করে কিছু টাকা লাভ ধরে বিক্রেতারা তাদের শশার মূল্য ঠিক করেন।

সকালের দিকে মোটামুটি সকল সব্জি বিক্রেতাই একই মূল্য নির্ধারণ করেন। তবে বেলা যতো বাড়তে থাকে, তাদের মূল্যের উঠানামাও তেমনি বাড়তে থাকে। সেলিম মিঞা মনে মনে ঠিক করেন তিনি যদি দুপুর নাগাদ ৩০ কেজির মধ্যে অন্তত ২০ কেজি শশা বিক্রি করে ফেলতে পারেন, তাহলে বাকি দিনে আরো ১০ কেজি বিক্রি করতে তার সমস্যা হবেনা। তাই বিক্রি বাড়লে তিনি সকালের দামের চেয়ে বিকালে দামটা কিছুটা বেশি ধরেন। সকালে ১৮ টাকা কেজি হলে বিকালে একই শশার মূল্য কেজি প্রতি আরও ১-২ টাকা তিনি বাড়িয়ে দেন। একই ঘটনা ঘটে অন্যান্য সব্জি বিক্রেতার বেলাতেও।

সেলিম মিঞা এটাও হিসাবে রাখেন যে তাকে প্রতিদিন অন্তত ১০ কেজি শশা বিক্রি করতেই হবে কারণ তার ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য পুঁজির প্রয়োজন। তাকে দোকান ভাড়া গুনতে হয়। সেইসাথে রয়েছে সাংসারিক খরচ। ঢাকায় যদি কোন গন্ডগোল না হয়, কোন প্রকার ঝড়বৃষ্টি যদি না থাকে, তাহলে বাজারে ক্রেতা সমাগম হয় বেশি। তাই প্রতিদিনের শশা বিক্রি করতে সেলিম মিঞাদেরকে সাধারণত কোন বেগ পেতে হয় না।

সেলিম মিঞা বুঝতে পারছেন, ইদানিং ক্রেতারা আগেও চেয়েও শশা বেশি কিনছে। হতে পারে তাদের টাকা বেড়েছে, না হয় অন্য কোন খাবার না খেয়ে তারা শশা বেশি খাচ্ছে। তবে এই সব ব্যাপারে সেলিম মিঞার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তিনি তার শশা বিক্রি করতে পারলেই খুশি।

একদিন তিনি কাওরান বাজার থেকে আসার পথে হঠাৎ শুরু হল বৃষ্টি। এই বৃষ্টি চলল আরো অনেকক্ষণ। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে গেল। সেলিম মিঞা প্রমাদ গুনলেন। তিনি আগেভাগেই ধরে নিলেন, আজকে বাজারে ক্রেতা সমাগম কম হবে। তাই তাকে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় শশাগুলি বিক্রি করে দিতে হবে।

দিনশেষে দেখা গেল বাজারে ক্রেতা সমাগম এতোটাই কম হয়েছে যে, তিনি ৩০ কেজির মধ্যে মাএ ১৫ কেজি শশা বিক্রি করতে পেরেছেন। বাকি শশা হয়তো কোনভাবে তিনি আরও একদিন বিক্রি করতে পারবেন, তবে এরপরে ভ্যাপসা গরমের কারণে শশায় পচন ধরবে। তাছাড়া ক্রেতারাও শশা দেখলে বুঝতে পারবে, এটি তাজা কিনা। তাই হঠাৎ বৃষ্টির কারণে সেদিন সেলিম মিঞাকে লোকশান গুনতে হল।

তবে সেলিম মিঞাদের বাজারের কয়েক মাইলের মধ্যে আরো যে একটি বাজার আছে, সেখানে এই সমস্যাটি হয়নি। কারণ বাজারে পানি ওঠেনি এবং বাজারটি একটি ঘনবসতিপুর্ণ এলাকার কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে ক্রেতা সমাগম খুব একটি কমেনি।

সেখানকার যে ওয়ার্ড কমিশনার আছেন, তিনি তার কর্ম তৎপরতার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ নাম কামিয়ে ফেলেছেন। সিটি কর্পোরেশনকে ধরে তিনি বাজারের কাছের সকল রাস্তা উঁচু করেছেন, ড্রেনগুলোও পরিস্কার করেছেন। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে জলাবদ্ধতার যে সমস্যায় তার এলাকাবাসীরা ভুগছিল, সেই সমস্যাটি এখন আর নেই। তাই সেলিম মিঞা শুনেছেন, ওই বাজারে সব্জি বিক্রেতাদের নাকি আজ খুব একটা লোকশান হয়নি। তারা তাদের সকল শশাই আজ বিক্রি করতে পেরেছে।

দেশে বিরোধী দল যখন হরতাল ডাকে, তখনও বাজারে ক্রেতা সমাগম আগের চেয়ে কমে যায়। তাই সেলিম মিঞারা তাদের প্রতিদিনের শশা কেনার পরিমাণও কমিয়ে দেন। মুল্য নির্ধারণেও তাদের ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বাজারে সব্জির মুল্যের দিনব্যাপী উঠানামাও কমে যায়। এতে ভোক্তাদের হয়তো কিছু লাভ হয়, তবে ক্ষতি হয় সব্জি বিক্রেতাদের। এমন অনেক দিন গেছে, যখন তাদেরকে সপ্তাহব্যাপী লোকশান গুনতে হয়েছে। বিশেষ করে যেবার লাগাতার হরতাল শুরু হয়েছিল, তখন বাজারে ক্রেতা সমাগম এতোটাই কমে গেল যে, সকল সব্জি বিক্রেতাদেরই মাথায় হাত।

সেলিম মিঞা তাই আলাহ্‌র কাছে দোয়া করেন যেন ভবিষ্যতে হরতাল কম হয়। তিনি এটাও দোয়া করেন এলাকার ওয়ার্ড কমিশনাররা যেন আরো বেশি কর্ম তৎপর হয়। তারা যেন রাস্তাঘাটকে আরো উঁচু করে, ড্রেনগুলো যেন সবসময় পরিস্কার রাখে।

এই উদাহরণ থেকে আশা করি সকলেই একটি ধারণা পেয়েছেন, আমাদের দেশের বাজারগুলিতে কেন দ্রব্যমুল্য এতোটা ওঠানামা করে। সাম্প্রতিককালে মিডিয়ার অনেক রিপোর্টে দেখা গেছে একটি বাজারের সাথে আরেকটি বাজারে একই পণ্যের মুল্যের মধ্যে উলেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। দিন শেষে একই পণ্যের মুল্য যে বাড়তে থাকে, সেই সত্যটিও মিডিয়ার অনেক রিপোর্টে উঠে এসেছে।

এই পেপারের শুরুতেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জনবসতির ঘনত্ব এতোটাই বেশি যে, এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা অত্যাধিক। তাই খুচরা ব্যবসায়ীরা যদি দেখে তারা স্টক বাড়ালেও দিন শেষে সেই স্টক ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তারা দাম কমাবে কেন?

মুলতঃ এই কারণেই আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমলেও তা খুচরা বাজারে খুব কমই প্রভাব ফেলে। একই কারণে মুল্য একবার বেড়ে গেলে তা আর সহজে আগের পর্যায়ে আসেনা। কারণ ব্যবসায়ীরা ততোদিনে বুঝে গেছে বাজারে ক্রেতার খরচ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা যাকে অর্থনৈতিক পরিভাষায় বলা হয় Consumers Willingness to Pay। তারা বুঝে গেছে এই অতিরিক্ত

মূল্যতেও তার স্টক ফুরানোর জন্য ক্রেতার অভাব হবে না। এই কারণেই ২০০৪-২০০৭ মধ্যবর্তী সময়ে চালের বাজারে খুচরা বিক্রেতাদের অংশ অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের ধারণা একই ধরণের গবেষণা যদি শাক-সব্জির বেলাতেও করা হতো, তাহলেও আমরা একই চিত্র পেতাম।

এই প্রবণতা বেড়ে যাবে আগামীতে দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হলে। প্রবৃদ্ধি বাড়লে ক্রেতার আয় বাড়ে। ফলে বাড়ে চাহিদা। তাই মূল্যের ওঠানামাও বাড়ে প্রায় একই হারে।

এখানে পাঠকরা লক্ষ্য করুন, সেলিম মিঞা একজন খুচরা বিক্রেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার কিনে আনা শশার মূল্য নিজেই ঠিক করতে পারছেন। তিনি পাইকারী মূল্যের সাথে পরিবহন খরচ যোগ করার পর একটি নির্দিষ্ট লাভ ধরে শশাগুলির বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করছেন। বেশিরভাগ সময়েই তিনি তার কাঙ্খিত মূল্যে শশা বিক্রি করতে পারেন যদিনা ঝড়-বৃষ্টি কিংবা অন্যান্য সমস্যার কারণে বাজারে ক্রেতা সমাগম কম না হয় । ফলে দিন দিন তার আয়ও বাড়ছে। বাড়ছে বিনিয়োগের পরিমাণও। তার আর্থিক অবস্থাও ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই শশা যে উৎপাদন করেছে, সেই প্রান্তিক কৃষক বাজারের এই সুবিধাটি পান না। কারণ তিনি যখন তার উৎপাদন হাটে নিয়ে যান, তখন ফড়িয়াদের কাছে তাকে নামমাত্র মূল্যে সব্জি বিক্রি করে দিতে হয়, কারণ তার পণ্যগুলি পচনশীল। এই অসুহাতে ফড়িয়ারাও বেশি দাম দিতে রাজি থাকে না। মূলত এই কারণে পচনশীল সব্জির বেলাতে খুচরা মূল্যে কৃষকদের অংশ অন্যান্য শস্যের তুলনায় অনেক কম।

সংযুক্তি – ২

সরকারের সাম্প্রতিক দুটি পদক্ষেপ

এখানে বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের দুটি পদক্ষেপের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কিছু প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরা যেতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপটি ছিল ধানের ক্রয়মূল্য সংক্রান্ত। ২০০৮ সালের বোরো মৌসুমে সরকার ধানের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে কেজি প্রতি ১৮ টাকা এবং চালের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে কেজি প্রতি ২৮ টাকা। সরকারের যুক্তি ছিল বেশি দামের কারণে কৃষকরা তাদের শস্যের ন্যায্যমূল্য পাবে এবং সমাজে ধনীদের টাকা গরীবদের কাছে স্থানান্তর হবে।

সরকারের এই পদক্ষেপের কারণে বাজারে ধানের মূল্য বেড়ে যায়[২৭]। ফলে কৃষক কিছুটা হলেও উপকৃত হয়। কিন্তু এখানে খেয়াল রাখা দরকার, সরকার চাল কেনার জন্য চুক্তি করেছিল চালকল মালিকদের সাথে। তাই চালকল মালিকদের কাছে যখন শহুরে আড়তদাররা চাল কেনার অর্ডার দিয়েছে, তখন তারা বলেছে, আমি তো সরকারকেই ২৮ টাকা দরে চাল দিচ্ছি। তাই চাল পেতে হলে তোমাদেরকে আরও বেশি দাম দিতে হবে।

এই কারণে শহুরে আড়তদাররা বেশি দামে চাল কিনতে বাধ্য হয়েছে[২৮]। তারা খুচরা বিক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি করেছে আরও বেশি দামে। এই কারণেই ২০০৮ সালে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার কোন প্রকার সুফল ভোক্তা পায়নি। যে চাল আগের বছর তারা কিনেছে ২৫–২৮ টাকা দরে, সেই চালই তাদেরকে কিনতে হয়েছে প্রায় ৩৫ টাকা দরে।

সরকারের এই পদক্ষেপের কারণে কৃষকরাও কতটুকু লাভবান হয়েছে সেটাও আলোচনা করা দরকার।

---

[২৭] ধানের মূল্য বাড়ার এই প্রবণতা সারা দেশেই বিস্তৃত ছিল কিনা, তা পুরোপুরি পরিস্কার নয়। মিডিয়াতে মূলত বিভিন্ন মফস্বল মোকামের ধানের বাজার মূল্য সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কৃষক কি মূল্যে ধান বিক্রি করেছে সেই সংবাদটি খুব একটা মিডিয়াতে আসেনি।

[২৮] এই বিষয়টিও ইঙ্গিত করে যে বৃহৎ চাতালকল মালিকদের নের্তৃত্বে দেশের সর্বএ একটি ছায়াজোট গড়ে উঠেছে। কারণ সরকার চুক্তি করেছিল মাএ ১০–১৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল কেনার জন্য। কিন্তু আমাদের মোট বোরো উৎপাদন ছিল প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। তাই বাজারে যদি সুস্থ প্রতিযোগীতা থাকতো, তাহলে যে সকল চালকল মালিকদের সাথে সরকার চুক্তি করেনি, তারা আরও কম দামে চাল বিক্রি করে ফেলত। ফলে বাজারে চালের দাম এতোটা বাড়তো না। কিন্তু সরকার যেহেতু বৃহৎ চালকলগুলোর সাথে ২৮ টাকা কেজি দরে চাল কেনার চুক্তি করেছে, এবং যেহেতু এই সকল চালকল মালিকরা শহুরে আড়তদারদের কাছে আরও বেশি দামে চাল বিক্রি করেছে, সেহেতু অন্যান্য ছোট চালকল মালিকরাও এই প্রবণতা অনুসরণ করেছে। ফলে শহরে চালের দাম আর কমেনি।

বাংলাদেশে অধিকাংশ কৃষকই হতদরিদ্র। তাদের অধিকাংশেরই জমির পরিমাণ খুবই কম এবং এই জমি থেকে যে পরিমাণ শস্য আসে, সেই শস্য তাদের নিজেদের প্রয়োজনই পুরো মেটাতে পারে না। তাই কৃষক যে শস্য আজ ফলিয়েছে, বছর শেষে সেই শস্যই তাদেরকে আবার বাজার থেকে কিনতে হয় চড়া দামে।

২০০৮ সালে ধানের মূল্য কেজি প্রতি ১৮ টাকা নির্ধারণ করাতে কৃষকদের সাময়িক লাভ কিছুটা হয়েছে বটে, তবে বছর শেষে তাদেরকে এই চালই কিনতে হয়েছে প্রায় ৩৫ টাকা দরে। তাই তাদের জীবনমানের প্রত্যাশিত উন্নয়ন ঘটার কথা নয়। বরং এই মূল্য নির্ধারণে লাভবান হয়েছে শুধুমাএ মধ্যস্বত্বভোগীরাই।

সরকারের এই মূল্য ঠিক করে দেয়াতে দেশের আপামর কৃষক সমাজ আসলেই কতটুকু লাভবান হয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সরকারের মজুদকৃত চালের পরিমাণ দেশের মোট বোরো উৎপাদনের তুলনায় ছিল অতি সামান্য। তাই এই সামান্য পরিমাণ ধানের মূল্য ঠিক করে সারা দেশের ধানের বাজার মূল্য নির্ধারণ তাত্বিকভাবে সম্ভব নয়।

সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল চালকল মালিকদের ঋণদান সংক্রান্ত।

সরকার নিয়ম করেছিল কোন ব্যাংক চালকল মালিকদের তিনমাসের বেশি ঋণ দিতে পারবে না। সরকারের যুক্তি ছিল এই নিয়মের কারণে চালকল মালিকরা আর মজুদ করতে পারবে না। তাদেরকে বাধ্য হয়ে তিনমাসের মধ্যেই তাদের মজুদ বিক্রি করে দিতে হবে তাদের ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতার জন্য। তাই তাদের মজুদ করার প্রবণতা যদি কমে যায়, তাহলে বাজারেও তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ফলে ভোক্তা কম মূল্যে চাল কিনতে পারবে।

কিন্তু বাস্তবে কি ভোক্তা কম মূল্যে চাল কিনতে পেরেছে?

পারেনি। সমস্যাটা তাহলে কোথায় ছিল?

এর মূল সমস্যা কোথায় ছিল তা একটি গবেষণার বিষয় তবে নীচে এর একটি সম্ভাব্য কারণ দেয়া হল।

এর কারণ খুঁজতে আমাদেরকে সনাতনী সুদনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ম কানুন বুঝতে হবে।

বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় একটি ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে সরাসরি টাকা দেয়। এই টাকা ঋণগ্রহীতা তার ব্যবসাতে বিনিয়োগ করল কি করল না, তা নিয়ে ব্যাংকারদের কোন মাথা ব্যথা নেই। ব্যাংকারদের মুল লক্ষ্যই হল তাদের টাকা সুদে আসলে ফেরত পাওয়া।

গ্রামাঞ্চলে চালকল মালিকরা লোভনীয় ঋণগ্রহীতা। তাদের যেমন রয়েছে নগদ টাকার সরবরাহ, তেমনি বন্ধক দেয়ার মতো সম্পত্তিও তাদের রয়েছে। তাই গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকগুলো এই ধরণের ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দিতে উন্মুখ হয়ে থাকে।

সরকারের এই নিয়ম করার ফলে চালকল মালিকদের কিছু সমস্যা হয়েছে বটে, তবে তারা তিনমাস পরই অন্য আরেকটি ব্যাংকে গিয়ে ঋণ নিয়েছে এবং সেই টাকা দিয়ে আগের ঋণ পরিশোধ করেছে। ফলে তাদের মোট ঋণের পরিমাণ আগের মতোই থেকেছে। এর জন্য তাদের চালের মজুদ আগেভাগে বিক্রি করার প্রয়োজন হয়নি।

এই ধরণের ব্যবসায়ীরা যেহেতু লোভনীয় ঋণগ্রহীতা, তাই দ্বিতীয় ব্যাংকটি তাদেরকে ঋণ দিতে কোর প্রকার কার্পণ্য করেনি।

খুব সম্ভবত এই কারণেই সরকারের এই পদক্ষেপটি বাজারে চালের মূল্যের উপরে কোন প্রকার প্রভাব ফেলেনি।

তবে ব্যাংকগুলি যদি ঋণগ্রহীতাকে সরাসরি টাকা না দিয়ে পরোক্ষভাবে সম্পদের বিপরীতে ঋণ দিত, তাহলে চালকল মালিকদেরকে কিছুটা হলেও সমস্যার মধ্যে ফেলা যেত[২৯]।

যেমন প্রথম ঋণের বেলাতে একটি ব্যাংক চালকল মালিকদেরকে টাকা না দিয়ে সেই টাকা তারা দিত কৃষকদেরকে তাদের শস্যের বিপরীতে। ফলে চালকল মালিকরা কৃষকদের কাছ থেকে ধান নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করতে থাকতো।

[২৯] ঋণগ্রহীতাকে সরাসরি টাকা না দিয়ে পরোক্ষভাবে সম্পদের বিপরীতে ঋণ দেয়ার এই পদ্ধতি সারা বিশ্বে "ইসলামিক ব্যাংকিং" নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য, পবিএ কোরআন সহ অন্যান্য প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলিতে সুদ ভিত্তিক লেনদেনের উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

কিন্তু যেহেতু সরকার তিনমাসের বাধ্যবাধকতা করে দিয়েছে, সেহেতু চালকল মালিকদের আর দ্বিতীয় কোন ব্যাংকের কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকতো না। কারণ দ্বিতীয় ব্যাংকের কাছে গেলেই ব্যাংকার বলতো তুমি আগে কৃষক নিয়ে আস যার কাছে আমি শস্যের বিনিময় মূল্য হস্তান্তর করব।

কিন্তু চালকল মালিকদের তো প্রয়োজন নগদ টাকা যা দিয়ে তারা প্রথম ঋণের টাকা পরিশোধ করতে চাচ্ছে। তাদের তো শস্যের আর প্রয়োজন নেই।

তাই চালকল মালিকরা পড়ে যেত বিপদে। তাই প্রথম ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য তাদেরকে বাধ্য হয়ে কম দামে তাদের মজুদকৃত চাল বাজারে ছেড়ে দিতে হতো। ফলে বাজারেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তো।

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে তো সকল ব্যাংক যদি এখন সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ দেয়া শুরু করে, তাহলেই তো বাজারের এই ব্যর্থতা কাটানো যায়। এর জন্য তো এতো টাকা খরচ করে কৃষকদের হাতে তাদের শস্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়ার দরকার নেই।

না। এটি সম্ভব নয়, কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে যতোদিন বাজার চালনার ক্ষমতা থাকবে, ততোদিন তারা কোন না কোন উপায়ে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। যেমন, তারা এখানে একজন নকল কৃষককে হাজির করে ব্যাংকের টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। তাই এই ধরণের অবৈধ পন্থা রোধের জন্য ব্যাংককে নজরদারী বাড়াতে হবে এবং দেখতে হবে ঋণগ্রহীতার সত্যিই টাকার প্রয়োজন আছে কিনা এবং তা কেন।

আবার নজরদারী বাড়ানোর ফলে চালকল মালিকরা যদি সত্যি সত্যি চাপে পড়ে যায়, তাহলে তারা এই চাপ ভোক্তাদের উপরে ফেলে দিতে পারে চালের মূল্য বাড়িয়ে। ফলে বাজারে চালের মূল্য না কমে বরং আরো বেড়ে যেতে পারে।

তাই বাজারের এই ব্যর্থতা কাটানোর জন্য সরকারের সহায়তায় কৃষকদের হাতে তাদের শস্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা তুলে দেয়ার বিকল্প কিছু নেই।

Bibliography

A Crisis in the Rice Economy by P.K. Ghosh and Barbara Harriss-White. Volume 19, Issue 19 of Frontline - India's National Magazine from the Publisher of The Hindu. September 14-27, 2002.

A Dairy Cooperative Society by HG Muriuki. FAO. Undated.

A Study on Price Spreads of Major Crops in Selected Markets of Bangladesh by Mohammad Ismail Hossain, Mohammad Nurul Huda, Mst. Ismat Ara Begum, Md Akhtaruzzaman Khan, and Md Golam Rabbani. Journal of Applied Sciences 4(4), Page 513-520. Asian Network for Scientific Information. 2004.

Agricultural Development: Issues, Evidence, and Consequences by Yair Mundlak, Donald F. Larson and Al Crego. Policy Research Working Paper 1811. The World Bank. August, 1997.

Agricultural Economics and Management by Kenneth L. Casavant, Craig L. Infanger and Deborah E. Bridges. Prentice Hall. 1999.

Agricultural and Food Marketing Management by I.M. Crawford. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 1997.

Agricultural Growth and Poverty Reduction: A Scoping Study by Steve Wiggins. IDRC Working Papers on Globalization, Growth and Poverty. March, 2006.

Agricultural Liberalization and the Least Developed Countries: Six Fallacies by Arvind Panagariya. World Economy: Global Trade Policy. 2005.

Agricultural Markets and Risks: Management of the Latter, Not the Former by Panos Varangis, Donald Larson, and Jock R. Anderson. Policy Research Working Paper 2793. The World Bank. February, 2002.

Agricultural Markets in Benin and Malawi: The Operation and Performance of Traders by Marcel Fafchamps and Eleni Gabre-Madhin. Policy Research Working Paper 2734. The World Bank. December, 2001.

Agricultural Policy Reform: Developments and Prospects. OECD Observer, June 2000.

Agricultural Trade and the Livelihoods of Small Farmers. Discussion Paper for DFID Towards Development of a White Paper on Globalization. Oxfam GB Policy Department. March, 2000.

Agricultural Trade Reform and Poverty Reduction in Developing Countries by Kym Anderson. World Bank Policy Research Working Paper 3396. September, 2004.

Agricultural Trade`Reform and Poverty Reduction in Developing Countries by Kym Anderson. IIIS Discussion Paper 14. CEPR, and School of Economics and Centre for International Economic Studies, University of Adelaide, Australia. January, 2004.

Agriculture and Non-Agricultural Liberalization in the Millennium Round by Thomas W. Hertel, Kym Anderson, Joseph F. Francois and Will Martin. Policy Discussion Paper No. 0016 of Centre for International Economic Studies, University of Adelaide, Australia. March 2000.

Agriculture and Poverty in South Africa: Can Agriculture Reduce Poverty? By Charles L. Machethe. Paper Presented at the Overcoming Underdevelopment Conference held in Pretoria. October 28-29, 2004.

Agriculture and Poverty Reduction: Unlocking the Potential by Jonathan Wadsworth. Rice Today. April, 2004.

Agriculture and Poverty reduction: Unlocking the Potential. DFID Policy Paper. December 2003.

An Economic Assessment of the Myanmar Rice Sector: Current Developments and Prospects by Kenneth B. Young, Gail L. Cramer and Eric J. Wailes. Research Bulletin 958 of Arkansas Agricultural Experiment Station, Division of Agriculture, University of Arkansas. February 1998.

Back to the Future: The Globalization of Agriculture in Historical Context by Peter A. Coclanis. Published in SAIS Review, Vol. XXIII No. 1. Winter–Spring, 2003.

Bangladesh Dairy Cooperative Lifts Farmers Out of Poverty. FAO News Room Focus. August 2002.

Bangladesh Economy in FY 2007-08: An Interim Review of Macroeconomic Performance by Centre for Policy Dialogue (CPD). Report Prepared by the CPD under the Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD) Programee. June 04, 2008.

Bangladesh: Strategy for Sustained Growth. Bangladesh Development Series Paper no. 18. The World Bank. July, 2007.

Can the World Cut Poverty in Half? How Policy Reform and Effective Aid Can Meet International Development Goals by Paul Collier and David Dollar. Policy Research Working Paper 2403. The World Bank. July, 2000.

Chronic Poverty in Bangladesh: Tales of Ascent, Descent, Marginality and Persistence by Various Authors. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and University of Manchester. May 2004.

Commodity Markets, Price Limiters and Speculative Price Dynamics by Xue-Zhong He and Frank Westerhoff. Research Paper 136. Quantitivate Finance Research Centre. University of Technology Sydney. October, 2004.

Contractual Constraints on Firm Performance in Developing Countries by Dilip Mookherjee. Paper prepared for the Session on Industrial Organization and Development at the Latin American meetings of the Econometric Society. August, 1999.

Determinants of Rural Poverty in Post-War Mozambique: Evidence from a Household Survey and Implications for Government and Donor Policy by Tilman Bruck. QEH Working Paper Series 67. University of Oxford. March, 2001.

Determinants of Transient and Chronic Poverty: Evidence from Rural China by Jyotsna Jalan and Martin Ravallion. Policy Research Working Paper 1936. The World Bank. June, 1998.

Developing Country Agriculture in 2050: Envisioning the Future by Robert L. Thompson. February 27, 2004.

Do Farmers Choose to be Inefficient? Evidence from Bicol, Philippines by Donald F. Larson and Frank Plessmann. Policy Research Working Paper 2787. The World Bank. February, 2002.

Does Globalization Reduce Poverty? Some Empirical Evidence for the Developing Countries by Enrico Santarelli and Paolo Figini. December 20, 2002.

Dynamics of Vegetables in Bangladesh by Shahiduzzaman M. Elias and Muhammad S. Hussain.

Ending Africa's Poverty Trap by Jeffrey D. Sachs, John W. McArthur, Guido Schmidt-Traub, Margaret Kruk, Chandrika Bahadur, Michael Faye, and Gordon McCord. April 29, 2004.

Estimating the Poverty Impacts of Trade Liberalization by Jeffrey R. Reimer. GTAP Working Paper No. 20. 2002.

Explaining Agricultural and Agrarian Policies in Developing Countries by Hans P. Binswanger and Klaus Deininger. Policy Research Working Paper 1765. The World Bank. May, 1997.

Farm Size and the Determinants of Productive Efficiency in the Brazilian Center-West by Steven M. Helfand. Presented in the 25th International Conference of the International Association of Agricultural Economist (IAAE) in Durban, South Africa, August 16-22, 2003.

Fighting Poverty Through Agriculture: Norwegian Plan of Action for Agriculture in Norwegian Development Policy. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 2004.

Financial Development, Growth and Poverty: How Close are the Links? By Patrick Honohan. World Bank Policy Research Working Paper 3203 . The World Bank. February, 2004.

Financial Liberalization and Poverty: Channels of Influence by Philip Arestis. Working Paper No. 411. The Levy Economics Institute of Bard College. July, 2004.

Financing of Agricultural Marketing: Case Studies from Asia by Andrew W. Shepherd. FAO. Undated.

Food Emergencies, Food Security and Economic Progress in Developing Countries by Mwita Rukandema and A.A. Gurkan. Commodity Market Review, 2003-2004. FAO Corporate Document Repository.

Food Import Bills: Experiences, Factors Underpinning Changes and Policy Implications for Food Security of Least Developed and Net Food Importing Developing Countries by A.A. Gurkan, Kelvin Balcombe and Adam Prakash. Commodity Market Review, 2003-2004. FAO Corporate Document Repository.

Food Market Price, Stocks and Public Food Distribution System. Presentation made by the Food Planning and Monitoring Unit (FPMU) of Ministry of Food, Government of Bangladesh on June 17, 2002.

Food Security and Agricultural Sustainability by Peter Nijkamp and Gabriella Vindigni. Tinbergen Institute Discussion Paper. 2000.

Food Security and Markets in Indonesia: State-Private Sector Interaction in Rice Trade by Bustanul Arifin, Achmad Munir, Enny Sri Hartati and Didik J. Rachbini. Management and Organizational Development for Empowerment and South East Asian Council for Food Security and Fair Trade. February, 2001.

Food Security and Nutritional Well Being in Bangladesh - Lessons Learned and Tasks Ahead by Mirza Altaf Hossain. Paper Presented at the Regional Seminar on "Feeding Asian Cities" held in Bangkok, Thailand. November 27-30, 2000.

Food Security in Asia: Indonesia by Consumers International. Undated.

Food Security in Asia: Philippines by Consumers International. Undated.

Food Security in Asia: Thailand by Consumers International. Undated.

Foodgrain Price Stabilization in Developing Countries: Issues and Experiences in Asia by Nurul Islam and Saji Thomas. Food Policy Review 3. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Undated.

Foreign Aid Policy and Sources of Poverty: A Quantitative Framework by Alex Mourmouras and Peter Rangazas. IMF Working Paper WP/06/14. 2006.

Fourth LDC Ministerial Symposium: Industrial Capacity Building and Entrepreneurship Development in LDCs with Particular Emphasis on Agro Related Industries. Prepared by UNIDO Secretariat. Vienna, Austria from 26 November - 5 December, 1997.

From Prices to Incomes: Agricultural Subsidization Without Protection? By John Baffes and Jacob Meerman. Policy Research Working Paper 1776. The World Bank. June, 1997.

Global Impacts of the Doha Scenarios on Poverty by Kym Anderson, William J. Martin, and Dominique van der Mensbrugghe. World Bank Policy Research Working Paper 3735. The World Bank. October, 2005.

Globalization, Poverty and Food Security: Towards the New Millennium by Utsa Patnik. South Asia Documents. 2002.

Globalization, Poverty and Inequality Since 1980 by David Dollar. World Bank Policy Research Working Paper 3333. The World Bank. June, 2004.

Government Policy and Farmers' Decision Making: The Agricultural Diversification Programme for the Chao Phraya River Basin (1993 - 1995) Revisited by Siriluck Sirisup, H. Detlef Kammeier. Undated.

Government's Role in Pakistan Agriculture: Major Reforms are Needed by Rashid Faruqee. Policy Research Working Paper 1468. The World Bank. June, 1995.

Grain Marketing Parasatals in Asia: Why Do They Have to Change Now? By Shahidur Rashid, Ralph Cummings Jr., and Ashok Gulati. MTID Discussion Paper No. 80. International Food Policy Research Institute (IFPRI). January, 2005.

Growth and Poverty Reduction in Ethiopia: Evidence from Household Panel Surveys by Arne Bigsten, Bereket Kebede, Abebe Shimeles, and Mekonnen Taddesse. Working Papers in Economics 65. Goteborg University. January, 2002.

Growth, Income Distribution, and Poverty: A Review by Arne Bigsten and Jorgen Levin. Working Papers in Economics 32. Goteborg University. November 3, 2000.

Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages by Martin Ravallion. Policy Research Working Paper 2558. The Wolrd Bank. February, 2001.

Household Welfare and Poverty Dynamics in Burkina Faso: Empirical Evidence from Household Surveys by Hippolyte Fofack, Celestin Monga, and Hasan Tuluy. Policy Research Working Paper 2590. The World Bank. April, 2001.

How Can the Impoverishment of the Poorest Countries Be Stopped? By Rubens Ricupero. UNU Public Lectures. May, 2003.

Interlinkage in the Rice Market of Ghana: Money-lending Millers Enhance Efficiency by Jun Furuya and Takeshi Sakurai. Presented in the 25th International Conference of the International Association of Agricultural Economist (IAAE) in Durban, South Africa, August

16-22, 2003.

Interventions and Production Sector Waste in LDC Agroculture by Lilyan E.Fulginiti and Richard K. Perrin. Published in Journal of Agricultural and Resource Economics, 19(2): 327-336. 1994.

Islamic Futures and Their Markets: With Special Reference to their Role in Developing Rural Financial Market by M. Fahim Khan. Research Paper No. 32. Islamic Research and Training Institute. Islamic Development Bank. 1997.

Land Reform, Poverty Reduction and Growth: Evidence from India by Timothy Besley and Robin Burgess. The Development Economics Discussion Paper Series. The Suntory Centre, London School of Economics. October, 1998.

Land System, Agriculture and Poverty in Uzbekistan by Azizur Rahman Khan. University of California, Riverside. May 1, 2005.

Liberalisation of the Crop Sector: Can Bangladesh Withstand Regional Competition? by Mahabub Hossain and Uttam Kumar Deb. CPD-IRRI Policy Brief 4, Centre for Policy Dialogue (CPD), Bangladesh. September 2003.

Low Spending on Agri Research to Spell Doom: WB. New Age. August 6, 2005.

Making Agrocultural Market Systems Work for the Poor: Promoting Effective, Efficient and Accessible Coordination and Exchange by Andrew Dorward and Jonathan Kydd. February 2005.

Market Efficiency and Marketing to Enhance Income of Crop Producers by Carl R. Zulauf and Scott H. Irwin. OFOR Paper No. 97-04. October, 1997.

Market Integration and Price Transmission in Selected Food and Cash Crop Markets of Developing Countries: Review and Applications by George Rapsomanikis, David Hallam and Piero Conforti. Commodity Market Review, 2003-2004. FAO Corporate Document Repository.

Market Integration for Agricultural Output Markets in Peru: the Role of Public Infrastructure by Javier Escobal D'Angelo.

Market Integration in Wholesale Rice Markets in India by Raghbendra Jha, K.V. Bhanu Murthy, and Anurag Sharma. ASARC Working Paper 2005/03. 2005.

Middlemen Blamed for Rice Price Spiral. New Age Business. July 25, 2005.

Millennium Development Goals: Strengthening Mutual Accountability, Aid, Trade and Governance. Global Monitoring Report 2006. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 2006.

Modelling Determinants of Poverty in Eritrea: A New Approach by Eyob Fissuh and Mark Harris. Monash University. Undated.

New Directions for Agriculture in Reducing Poverty: The DFID Initiative by Michael Lipton. March, 2004.

No Place for Agriculture in Policy, Dev Planning by Tanim Ahmed. New Age. August 6, 2005.

On the Efficiency of Markets for Agricultural Products: Rice Prices and Capital Markets in 19th Century Java by Jan Luiten van Janden. International Institute of Social History. Undated.

Poverty Alleviation: Is Economics Any Help? Lessons from the Grameen Bank Experience by Muhammad Yunus. Journal of International Affairs, Vol. 52. 1998.

Persistent Poverty and Excess Inequality: Latin America, 1970-1995 by Juan Luis Londono and Miguel Szekely. Journal of Applied Economics, Vol. III, No. 1, Page 93-134. May, 2000.

Plunging into Food Insecurity, Multilateral Liberalization in Agriculture and the Concern of Net Food Importing Countries: The Case of Bangladesh by Rashed Al Mahmud Titumir and Golam Sarwar. Unnayan Onneshan - The Innovators. June, 2006.

Policy Brief on "Agricultural, Development and Rural Economy", CPD Task Force Report for Election 2001: National Policy Forum. Organized by Centre for Policy Dialogue, Prothom Alo, and The Daily Star in Dhaka from 20-22 August, 2001.

Poor Health, Food Insecurity, and Poverty - How to Break a Vicious Circle? By Samuel Bota. National Resources College, Malawi. Undated.

Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation by Amartya Sen. Oxford University Press. 1982.

Poverty and Inequality in India: A Reexamination by Angus Deaton and Jean Dreze. Working Paper No 107. Centre for Development Economics. August, 2002.

Poverty Impacts of a WTO Agreement: Synthesis and Overview by Thomas W. Hertel and L. Alan Winters. World Bank Policy Research Working Paper 3757. The World Bank. October, 2005.

Poverty Traps by Costas Azariadis and John Stachurski. Prepared for the Handbook of Economic Growth. Undated.

Poverty Traps, Aid, and Growth by Aart Kraay and Claudio Raddatz. World Bank Policy Research Working Paper 3631. The World Bank. June, 2005.

Predicting the Poverty Impacts of Trade Reform by Thomas W. Hertel and Jeffrey J. Reimer. World Bank Policy Research Working Paper 3444. The World Bank. November, 2004.

Price Dynamics in the Bangladesh Rice Market: Implications for Public Intervention by Donna Brennan. Elsevier Science. July, 2003.

Price Liberalization and Farmer Welfare Under Risk Aversion: Cotton in Benin and Ivory Coast by Paul Makdissi and Quentin Wodon. February, 2004.

Price of Daily Essentials: A Diagnostic Study of Recent Trends: Overview and Summary. Centre for Policy Dialogue (CPD), Bangladesh. May, 2007.

Raising the Standard of Living in the Developing World: Challenge to International Institutions in a Global Context by John-ren Chen. Opening Address to the CSI Annual Conference on the Nov 19th 2003.

Reducing Agricultural Tariffs versus Domestic Support: What's More Important for Developing Countries by Bernard Hoekman, Francis Ng, and Marcelo Olarreaga. Policy Research Working Paper 2918. The World Bank. March, 2003.

Review of Food Sector and Policy Options for Food Security by Quazi Shahabuddin.

Revitalizing Agriculture for Poverty Reduction and Economic Growth by Kipruto arap Kirwa. Presentation Made at the Consultative Group Meeting for Kenya.

Rice Farmers' Returns in Selected Area in Jessore District of Bangladesh by Shaikh Moksadur Rahman and Jun TAKEDA. Journal of Applied Sciences 6(8): 1731-1737. 2006.

Rice Policy in the Transition: From State Control to Market Orientation. Policy Brief No. 5. Bappenas/USAID/DAI Food Policy Advisory Team. March, 2000.

Rice Price Stabilization in Bangladesh: An Analysis of Policy Options by Paul Dorosh and Quazi Shahabuddin. MSSD Discussion Paper No. 46. International Food Policy Research Institute (IFPRI). October, 2002.

Rice Price Stabilization in Madagascar: Price and Welfare Implications of Variable Tariffs by Paul Dorosh and Bart Minten. SAGA Working Paper. November, 2005.

Rural Poverty in India: Structure, Determinants, and Suggestions for Policy Reform by Raghbendra Jha. Undated.

Saifur Hints at Rate Hike for Rice Millers, Sees Farmers Hoarding a Reason for Price Hike. New Age Business. July 25, 2005.

Searching for Common Ground. European Union Enlargement and Agricultural Policy. Edited by Kate Hathaway and Dale Hathaway. FAO Agricultural Policy and Economic Development Series 1. 1997.

Self Help Groups Replacing Cooperative Societies. The Hindu. December 26, 2004.

Sources of Income Inequality and Poverty in Rural Pakistan by Richard H. Adams, Jr. and Jane J. He. Research Report 102. International Food Policy Research Institute. 1995.

Speculative Price Bubbles in the Rice Market and the 1974 Bangladesh Famine by Munir Quddus and Charles Becker. Journal of Economic Development. Volume 25, Number 2, December, 2000.

State Intervention and Private Sector Participation in Philippine Rice Marketing by Charmaine G. Ramos. Management and Organizational Development for Empowerment and Southeast Asian Council for Food Security and Fair Trade. 2000.

Structural Adjustment in the Name of the Poor: The PRSP Experience in the Lao PDR, Cambodia and Vietnam by Jenina Joy Chavez Malaluan and Shalmali Guttal. Focus on the Global South. January, 2002.

Structural Determinants of Market Integration: The Case of Rice Markets in Bangladesh by Francesco Goletti, Raisuddin Ahmed and Naser Farid. Published in The Developing Economies, XXXIII-2 in June 1995.

Structural Determinants of Market Integration: The Case of Rice Markets in Bangladesh by Francesco Goletti, Raisuddin Ahmed and Naser Farid. Published in The Developing Economies, XXXIII-2 in June 1995.

Subsistence Farming, Adjustment Costs and Agricultural Prices: Evidence from Madagascar by Olivier Cadot, Laure Dutoit, and Marcelo Olarreaga. The World Bank. April, 2005.

Sustainable Agricultural Development and Poverty Alleviation in the New Millennium: Reflections and the Lessons from the Asian Crisis. 25th FAO Regional Conference for Asia and the Pacific, Yokohama, Japan. August 28 - September 1, 2000.

The Crisis in African Agriculture: A More Effective Role for EC Aid? Practical Action/PELUM. 2005.

The Determinants of Agricultural Production: A Cross Country Analysis by Yair Mundlak, Don Larson and Ritz Butzer. Policy Research Working Paper 1827. The World Bank. September, 1997.

The Disconcerting Pyramids of Poverty and Inequality of Sub-Saharan Africa by Paulo Silva Lopes. IMF Working Paper WP/05/47. 2005.

The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity Across Countries and Time Periods by Francois Bourguignon. Working Paper No. 2002-03. Centre National De La Recherche Scientifique. February, 2002.

The Impact of Globalisation on the Agricultural Sectors of East and Central African Countries by P. Robbins and R.S.B. Ferris. March, 2002.

The Impact of Structural Reforms on Poverty: A Simple Methodology with Extensions by Neil McCulloch. Policy Research Working Paper 3124. The World Bank. August, 2003.

The Impact of the Doha Debelopment Round of Trade Negotiations on Developing Countries: Results from ATPSM by Daneswar Poonyth and Ramesh Sharma. Commodity Market Review, 2003-2004. FAO Corporate Document Repository.

The Impacts of Trade Liberalisation on the World Rice Market by Chitrani Wijegunawardane Agbenyegah.

The Indian Experience of Liberalisation of Agriculture by Devinder Sharma. Talk Delivered at a Roundtable Conference on Agricultural Trade and Development Organized Jointly by the National Farmers Federation and Oxfam Australia. August 17, 2005.

The Integrated Macroeconomic Model for Poverty Analysis: A Quantitative Macroeconomic Framework for the Analysis of Poverty Reduction Strategies by Pierre-Richard Agenor, Alejandro Izquierdo, and Hippolyte Fofak. Policy Research Working Paper 3092. The World Bank. July, 2003.

The Least Developed Countries 1997 Report. United Nations Conference on Trade and Development. 1997.

The Least Developed Countries Report 2002: Escaping the Poverty Trap. United Nations Conference on Trade and Development. 2002.

The Nigerian Rice Economy in a Competitive World: Constraints, Opportunities and Strategic Choices: Strategy for Rice Sector Revitalization in Nigeria. West Africa Rice Development Association (WARDA). August, 2003.

The Nigerian Rice Economy in a Competitive World: Constraints, Opportunities and Strategic Choices: The Report of the Final Technical Workshop. Compiled by Olaf Erenstein and Frederic Lancon. West Africa Rice Development Association (WARDA).

August 20-21, 2003.

The Old Testament Anti-Usury Laws Reconsidered: The Myth of Tribal Brotherhood by Thomas Moser. Paper Presented at the ESHET Annual Conference in Marseille. February 27 – March 2, 1997.

The Organization of the Liberalized Rice Market in Vietnam by Luu Thanh Duc Hai. May, 2002.

The Policy Roots of Economic Crisis and Poverty: A Multi Country Participatory Assessment of Structural Adjustment by Structural Adjustment Participatory Review International Network (SAPRIN). April, 2002.

The Relationship Between Farm Size and Efficiency in South African Agriculture by Johan van Zyl, Hans Binswanger and Colin Thirtle. Policy Research Working Paper 1548. The World Bank. November, 1995.

The Road Half Travelled: Agrocultural Market Reform in Sub Saharan Africa by Mylene Kheralla, Christopher Delgado, Eleni Gabre-Madhin, Nicholas Minot and Michael Johnson. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Undated.

The Role of Agriculture in Poverty Alleviation: Insights from Village Studies in South Asia and Southeast Asia by Mahabub Hossain. Paper Delivered at the Asia and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty Reduction held at the Asian Development Bank, Manila, Philippines. February 5-9, 2001.

The Role of Agriculture in Poverty Reduction in Pakistan. Proceedings of a Seminar Organized by the International Food Policy Research Institute and Beaconhouse National University. Lahore, Pakistan. March 12, 2005.

The Role of Infrastructure and Government Policies in Determining the Efficiency on Kenya's Maize Marketing System in the Post Liberalization Era by J.T. Karugia, S.K. Wambugu, and W. Oluoch-Kosura. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Undated.

The Role of Marketing in Standard of Living: A Case Study of Rice Farmers in Bangladesh by Shaikh Moksadur Rahman, Jun TAKEDA, and Yoshiharu SHIRATAKE. Journal of Applied Sciences 5(1): 195-201. 2005.

The Rural Poverty Trap: Why Agricultural Trade Rules Need to Change and What UNCTAD XI Could Do About It. Oxfam Briefing Paper 59. June 11, 2004.

Towards Sustainable Development in Rural Africa by David Turnham. Policy Brief No. 6 of OECD Development Centre.1992.

Trade Liberalisation and Poverty by L. Alan Winters. Prus Working Paper No. 7. University of Sussex. April, 2000.

Trade Liberalisation and Poverty Dynamics in Vietnam by Yoko Niimi, Puja Vasudeva-Dutta, and Alan Winters. Prus Working Paper No. 17. University of Sussex. April, 2003.

Trade Liberalization & Food Security: Concerns of Developing Countries by Ashok Gulati. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Undated.

Trade Liberalization and the Structure of Poverty in Developing Countries by Thomas W. Hertel, Maros Ivanic, Paul V. Preckel and John A.L. Cranfield. Paper prepared for the "Conference on Globalization, Agricultural Development and Rural Livelihoods", Cornell University, Ithaca, New York, April 11-12, 2003.

Trade Liberalization and the Structure of Poverty in Developing Countries by Thomas W. Hertel, Maros Ivanic, Paul V. Preckel and John A.L. Cranfield. Paper prepared for the "Conference on Globalization, Agricultural Development and Rural Livelihoods", Cornell University. April 11-12, 2003.

Trade Reforms, Market Access and Poverty in Argentina by Guido G. Porto. Policy Research Working Paper 3135. The World Bank. September, 2003.

Trade, Growth and Poverty by David Dollar and Aart Kraay. WPS 2615. The World Bank. June, 2001.

Transformation of the Rice Marketing System and Myanmar's Transition to a Market Economy by Ikuko Okamoto. Discussion Paper No. 43 of Institute of Developing Economies. December 2005.

Trends and Driving Factors in Income Distribution and Poverty in the OECD Area by Michael F. Forster. OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers No. 42. OECD Publishing. 2000.

Undercutting Small Farmers: Rice Trade in Bangladesh and WTO Negotiations by Rashed Al Mahmud Titumir, M Iqbal Ahmed and Md M. Golam Sarwar. Unnayan Onneshan - The Innovators. 2005.

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বাংলাদেশের কৃষি। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ, বাংলাদেশ। উন্নয়ন অন্বেষণ –The Innovators, বাংলাদেশ। বর্ষ ২, সংখ্যা ২, নভেম্বর, ২০০৫।

World Poverty: Causes and Pathways by Partha Dasgupta. Plenary Lecture Delivered at the World Bank's Annual Bank Conference on Development Economics, Bangalore, India. May 21-22, 2003.

Websources:

http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml

লেখকের নিজের কথা

বাংলাদেশি নাগরিক। বর্তমানে সৌদি আরবের একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। পেশার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগে অগ্রনী। আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট (আইএফডি) প্রতিষ্ঠা করেন ২০০৯ সালে। বর্তমানে পরিচালনা করছেন United Against Alcohol (UAA) এবং United for Peace (UFP) নামের দুটি ফেসবুক ভিত্তিক ক্যাম্পেইন। **"বিনিয়োগ সাথী"** নামে একটি নতুন প্রজন্মের ব্যাংকিং মডেলের প্রবর্তক যা এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়নাধীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান আমেরিকাতে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই পত্রিকায় লেখালেখি শুরু। দেশের একাধিক সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকাতে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ তিন সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, ইন্টারনেটে বাংলা সংবাদপত্র পড়েন, এবং সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করেন।

© IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org